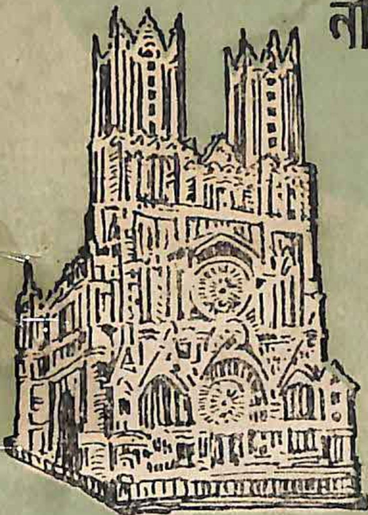
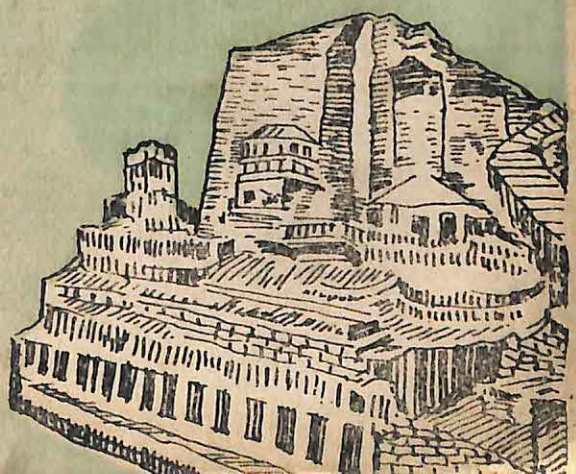
ইতিহাসের কাহিনী

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত





Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII.
[Vide Notification No. T. B. VII/H/81/80, dated 8. 1. 81.]

ইতিহাসের কাহিনী

(মধ্যযুগ)

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

প্রাক্তন অধ্যক্ষ : নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ;
ইউনিভার্সিটি বি. টি. অ্যাণ্ড ইভ্‌নিং কলেজ, কোচবিহার ;
শ্রীরামকৃষ্ণ বি. টি. কলেজ, দার্জিলিং ;
গভর্নমেণ্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলি ।
প্রাক্তন অধ্যাপক : ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা ।

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৮৫

মূল্য : ১৩ টাকা মাত্র
[মুদ্রিত মূল্যই বিক্রয়ের সঠিক মূল্য]

মুদ্রাকর :
শ্রীআশিসকুমার সরকার
প্রেসকো
১৩৪বি, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূ-চী-প-ত্র

ইতিহাসের কাহিনী

॥ ১ ॥

মধ্যযুগের পরিচয়

মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ আলোচনা করে ঐতিহাসিকেরা পৃথিবীর ইতিহাসকে তিনটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করেছেন। আমরা এখন ইতিহাসের 'নবযুগ' বা বর্তমান যুগে বিচরণ করছি। নব-যুগের পূর্ববর্তী যুগকে বলা হয়েছে 'মধ্যযুগ'। তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রাচীন যুগের সভ্যতার ইতিহাস পড়েছ, এখন পড়বে মধ্যযুগের কাহিনী। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে প্রায় এগারশো বছর ধরে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ চলছিল।

৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণে রোমের পতন ঘটে। রোম-সাম্রাজ্য ইতিমধ্যে ছুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জার্মান আক্রমণে পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এটি একটি বিখ্যাত ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিহাস পুরোনো পথ পরিবর্তন করে আর একটি যুগের দিকে পদক্ষেপ করলো। ঐতিহাসিকেরা বলেন, রোম-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটলো এবং মধ্যযুগের সূচনা হলো।

কিন্তু রোমের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ইউরোপবাসীর জীবনে মধ্যযুগ চেপে বসলো, এটা মনে করা উচিত হবে না। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দের একদিন ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ ইউরোপবাসী মনে করলো যে, তারা মধ্যযুগে বিচরণ করছে—তা কি প্রকারে সম্ভব? অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মধ্যযুগের মানুষের মনে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। রোমের পতন এই বিপুল পরিবর্তনের পথনির্দেশ করলো মাত্র।

নতুন রাজ্য, নতুন সাম্রাজ্য

জার্মান উপজাতিরা ইউরোপের মধ্যভাগে বসতি স্থাপন করে-ছিল। তারা ছিল তেজস্বী, অসম সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। ইউরোপের

এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নিজেদের দলপতিদের নেতৃত্বে তারা তাদের শক্তি সুদৃঢ় করে তুলেছিল। ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি যে সকল জার্মান উপজাতি রোমের পতনে অংশ নিয়েছিল, তারা তখন নিজেদের দলপতি বা রাজার নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুললো। এক সময়ে তারা দলে দলে রোমের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু রোমের পতনের পরে বিজিত অংশের ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে নিজেরাই আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে রোমের উপরে ভিসিগথ, স্পেনের উপরে ভ্যাণ্ডাল, মধ্য ইউরোপে ফ্রাঙ্করা কতকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করলো। নবম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্করা তাঁদের রাজা শার্লেমেনের নেতৃত্বে ইউরোপের একটি বড় অংশ অধিকার করেছিল। এই সময়ে রাজারা যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তেমনি শক্তিশালী হয়েছিল খ্রীস্টান ধর্মগুরু পোপের নেতৃত্বে যাজকশক্তি। পরবর্তী কালে কয়েকটি রাজবংশের চেষ্টায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি স্থানে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

নতুন সমাজ—নতুন অর্থনীতি

মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল, 'ফিউডালিজম্' বা সামন্ত-প্রথা। প্রাচীন যুগের সমাজ থেকে এ সমাজ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। এই যুগের প্রথম দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন প্রসার হয়নি। জমি বা ভূ-সম্পদ্ ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। এই সামন্ত-প্রথায় রাজা ছিলেন রাজ্যের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক। তাঁর নিকট থেকে ভূমি-গ্রহণ ও পরিবর্তে তাঁকে সামরিক সাহায্য দান—এই দুটি ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়। সামন্তেরা জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করায় জনসাধারণও শক্তিশালী সামন্তদের প্রভুত্ব বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল।

মধ্যযুগে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের, যথা—ছুতোরের কাজ, চামড়ার

কাজ, কাপড়বোনা, মাটির জিনিস তৈরি প্রভৃতি কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সামন্তরা এই সকল জিনিস শিল্পীদের কাছ থেকে ক্রয় করতেন। তাঁরা তাঁদের এলাকায় এই সব শিল্পীদের নিরাপদে বাস করার জন্য খানিকটা জায়গা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন শিল্পের চাহিদার ফলে বিস্তীর্ণ স্থানের প্রয়োজন হয়। ঐ পাঁচিল-ঘেরা স্থানগুলিই পরে শহরে পরিণত হয় এবং শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

নতুন শিক্ষাকেন্দ্র

মধ্যযুগের ইউরোপে জনসাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঐ যুগে ধর্মশিক্ষার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। ধর্মযাজকেরা গির্জায় বা মঠে প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখা পুঁথি নকল করতেন এবং ঐ বিষয়বস্তুই সাধারণকে শিক্ষা দিতেন। সাধারণ লোকের হাতে কোন পুঁথি দেওয়া হত না। বড় বড় গির্জাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে রোম-সম্রাটদের ন্যায় ভারতের গুপ্ত সম্রাটেরাও দুর্বল হয়ে পড়েন। মগধের পাটলিপুত্রকে রাজধানী করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যে সূচনা করেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর সুযোগ্য বংশধরদের চেষ্টায় সেই সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সাম্রাজ্য এক সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় হূন্ জাতি ভারত আক্রমণ করে। হূন্দের 'সাদা হূন্' নামে একটি শাখার নেতা তোরমান ও তাঁর পুত্র মিহিরকুল পশ্চিম ভারতের এক বিশাল অংশ বিধ্বস্ত করেন। পরবর্তী গুপ্ত রাজারা আভ্যন্তরীণ কলহে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হূন্ আক্রমণ

প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়, ফলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়ে পড়লো।

ভারতেও সামন্ত প্রথার উদ্ভব

মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ত-প্রথার অনুরূপ গুপ্ত রাজাদের আমলেও রাজাকে রাজস্ব দান ও প্রয়োজন মত সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে সামন্তদের ভূমিদান-প্রথার উদ্ভব হয়। তবে ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ সামন্ত-প্রথার সৃষ্টি হয়নি। মৌর্য ও গুপ্ত আমলে রাজার আয়ের প্রধান অংশ ছিল জমির উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ। তাছাড়া বন্দর ও ফেরিঘাট নির্মাণ এবং দুর্গ রক্ষা ও পরিচালনার জন্য রাজা প্রজাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। রাজাই ছিলেন মূলতঃ রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক এবং কতকগুলি শর্ত পালনের বিনিময়ে সামন্তরা রাজার নিকট থেকে জমি পেতেন এবং করের বিনিময়ে অধীনস্থ প্রজাদের জমি বণ্টন করে দিতেন। জোর-জবরদস্তি করে কৃষক বা শ্রমিকদের বেগার খাটানো বা 'ভিস্তি' আদায় সে যুগে নিন্দনীয় ছিল না।

মধ্যযুগের ব্যাপ্তি ইউরোপে ও ভারতে এক নয়

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ সময়কে মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত করেছেন; ভারত ও সমসাময়িক বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলসমূহ এই যুগব্যাপ্তির মধ্যে ঠিক পড়ে না। ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে যেমন দীর্ঘকাল অরাজকতা স্থায়ী হয়েছিল, সভ্যতার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল, ভারতে সেরকম কিছু ঘটেনি। হূন্-আক্রমণ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উপরে প্রবল আঘাত দিয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত-রাজারা তখনও মগধ রাজ্যের উপরে তাঁদের প্রভুত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরবীয় মুসলমান কর্তৃক সিন্ধুদেশের একটি অঞ্চল অধিকার ব্যতীত এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের

পূর্ব পর্যন্ত ভারতে বিশেষ কোনো বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেনি। ভারতের 'পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে, ভারতবাসী এই সময়ে পূর্বের শক, কুষাণ এবং পরবর্তী হূন্-আক্রমণের কথাও যেন ভুলে গিয়েছিল।

মধ্যযুগে এক রকম রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থা সর্বত্র বিদ্যমান ছিল একথা বলার পক্ষেও বিশেষ কোনো যুক্তি নেই। স্থানীয় পরিবেশে রাজতন্ত্র, সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি বিচিত্রতর হয়েছিল, একথা বলা যেতে পারে। মধ্যযুগীয় অসম সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ ঘটেছিল এবং শোষক ও শোষিতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে ইউরোপে কোন্ কোন্ নতুন রাজ্য কিভাবে গড়ে উঠেছিল ?

২। মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল ? এই নতুন সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। মধ্যযুগের ব্যাপ্তি ইউরোপে ও ভারতে এক নয় কেন ?

৪। ভারতে কিভাবে সামন্ত-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপের ইতিহাসে কোন্ সময়কে মধ্যযুগ বলা হয় ?

২। কবে এবং কেন রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল ?

৩। কয়েকটি জার্মান উপজাতির নাম লেখ যারা রোমের পতনে অংশ নিয়েছিল।

৪। রোম ও স্পেনের উপর কোন্ কোন্ স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয় ?

৫। শার্লেমেন কে ছিলেন ?

৬। ফিউডালিজম্ বলতে কি বুঝায় ?

৭। ধর্মযাজকেরা কিভাবে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতেন ?

৮। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন কে ?

৯। হূন্ কারা ?

১০। তোরমান ও মিহিরকূল কে ছিলেন ?

১১। "ভিস্তি আদায়" কাকে বলে ?

১২। কোন্ কোন্ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয় ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বন্ধনীর মধ্যে কোন্ কথাটি ঠিক তা নির্দেশ কর :—

(ক) রোমের পতন ঘটে—(৪৭০ খ্রীস্টাব্দে / ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে / ৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে)

(খ) নবম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কদের রাজা ছিলেন— (জুলিয়াস সীজার / হ্যানিবল / শার্লেমেন)

(গ) সাদা হূন্ শাখার একজন নেতা ছিলেন— (শার্লেমেন / তোরমান / চন্দ্রগুপ্ত)

(ঘ) মৌর্য ও গুপ্ত আমলে রাজার আয় ছিল জমির উৎপন্ন শস্যের— (এক-ষষ্টাংশ / এক-দশমাংশ / এক-চতুর্থাংশ)

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ যুগকে মধ্যযুগ বলে ?

২। রোমের পতন কবে হয়েছিল ?

৩। জার্মান উপজাতিরা কেমন লোক ছিল ?

৪। কয়েকটি জার্মান উপজাতির নাম কর।

৫। নবম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কদের রাজা কে ছিলেন ?

৬। ফিউডালিজম্ কি ?

৭। মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের কাজ কি ছিল ?

৮। কে কবে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন ?

৯। তোরমান কে ছিলেন ?

১০। সামন্ততন্ত্রে সমস্ত জমির মালিক কে ছিলেন ?

১১। কোন্ সময়কে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ?

॥ ২ ॥

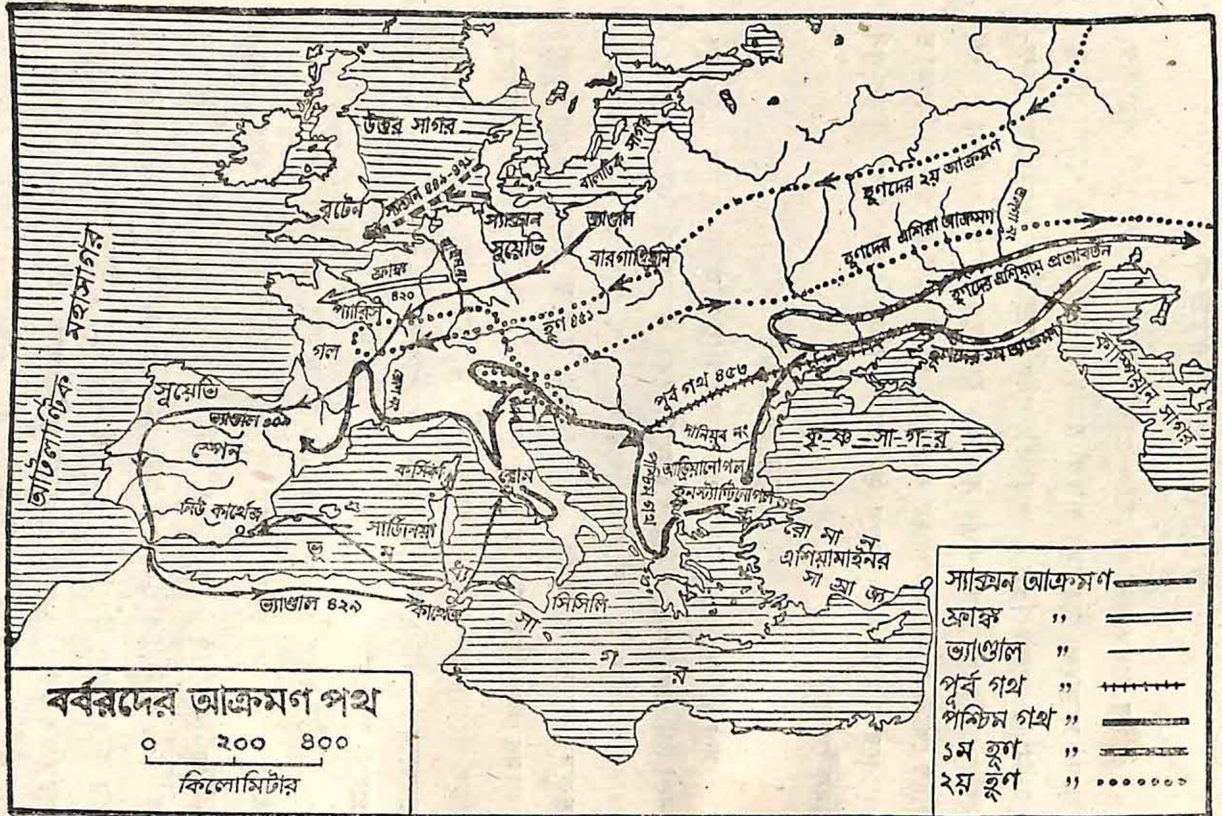
ইউরোপে মধ্যযুগ

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে প্রায় তিনশো বছর রোমের সম্রাটেরা তাঁদের সাম্রাজ্যে 'রোমের শান্তি' বজায় রেখেছিলেন। শাসন-ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। পরবর্তী দুর্বল সম্রাটেরা ভাড়াটিয়া সৈন্য-বাহিনীর উপরে নির্ভর করে সামরিক ব্যারাকে বাস করতেন। এই সময় থেকে সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল, সর্বত্রই একটা চাপা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। কিন্তু বিপদ এলো উত্তর-পূর্ব দিক থেকে।

হূন্ আক্রমণ

মধ্য এশিয়ার হূন্ নামে এক মাঙ্গোলীয় যাযাবর জাতি ডেনিয়ুব নদী অতিক্রম করে পূর্বাঞ্চলের জার্মানদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা যেখানেই যেতো সেখানেই প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করতো। হূন্দের গায়ের রং হলদে, নাক চ্যাপ্টা, মাথায় খাড়া খাড়া চুল। তাদের দেহে ছিল যেন অসুরের শক্তি। ঘোড়ার পিঠেই একরকম ছিল তাদের ঘর-বাড়ি। খাদ্যের সন্ধানে তারা ঘুরে বেড়াত এখানে-সেখানে। টাঙ্গি, বর্শা, তীর-ধনু, তলোয়ার—এ-গুলো ছিল তাদের প্রধান হাতিয়ার।

খ্রীস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে হূনেরা পূর্ব ইউরোপে প্রবেশ করে জার্মানদের হটিয়ে দিয়ে তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে রোম-সাম্রাজ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনে এক সময়ে সাহসী রোমান সৈন্যেরা পর্যন্ত ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠতো। হূন্দের আক্রমণে জার্মান গথ জাতি প্রথমে পরাজিত হয়। গথেরা এ সময়ে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল—পূর্ব গথ বা অস্ট্রোগথ, পশ্চিম গথ বা ভিসিগথ। হূন্দের আক্রমণে অস্ট্রোগথেরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভিসিগথেরা তাড়া খেয়ে


উত্তর সাগর
বাল্টিক
ব্রিটেন
স্যাক্সন
সুয়েভি
ফ্রাঙ্ক
৪২০
প্যারিস
গল
বারগাণ্ডিয়ান
হূণ ৪৫১
হূণদের ২য় আক্রমণ
হূণদের এশিয়া আক্রমণ
হূণদের এশিয়ায় প্রত্যাবর্তন
আটলান্টিক মহাসাগর
সুয়েভি
স্পেন
নিউ কার্থেজ
ভ্যাণ্ডাল ৪২৯
কার্থেজ
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
রোম
সিসিলি
ভূ ম ধ্য সা গ র
পূর্ব গথ ৪৫৩
দানিয়ুব নং
আড্রিয়ানোপল
কনস্ট্যান্টিনোপল
রো মা ন এশিয়ামাইনর সা ম্রা জ্য
কৃ-ষ্ণ-সা-গ-র
কাস্পিয়ান সাগর
বর্বরদের আক্রমণ পথ
০ ২০০ ৪০০
কিলোমিটার
স্যাক্সন আক্রমণ
ফ্রাঙ্ক ”
ভ্যাণ্ডাল ”
পূর্ব গথ ”
পশ্চিম গথ ”
১ম হূণ ”
২য় হূণ ”

ঢুকে' পড়ল রোম-সাম্রাজ্যের মধ্যে। তারা অনেকেই রোম-সম্রাটদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিল।

॥ ভিসিগথদের নেতা এলারিক ॥

রোম-সাম্রাজ্য ইতিমধ্যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্বাংশের রাজধানী ছিল কন্‌স্ট্যান্টিনোপল, আর পশ্চিমাংশের রাজধানী ছিল রোম। রোমের সেনাপতি ও রাজকর্মচারীদের দুর্ব্যবহারের ফলে ভিসিগথেরা তাদের তরুণ নেতা এলারিকের নেতৃত্বে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। রোমের বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য প্রাসাদ তারা ধ্বংস করে ফেললো। এক সময়ে এলারিক রোম-সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের বশ্যতা স্বীকার করলো; কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যের দুর্বলতা লক্ষ্য করে এলারিক পুনরায় রোম আক্রমণ করলো। রোমের সরকার সন্ধির প্রস্তাব দিতে বাধ্য হলেন, এলারিক শর্ত হিসাবে দাবি করলো, রাজ-কোষাগারের সমস্ত ধন-রত্ন। অন্যথায় রোম নগরী নিশ্চিহ্ন করে দেবে। রোমের দুর্বল সরকার ভীত হয়ে এলারিকের দাবি মেনে নিলেন। কিন্তু বাঘ একবার রক্তের আস্বাদ পেলে থেমে থাকতে পারে না, কিছুদিনের মধ্যেই এলারিক পুনরায় রোম আক্রমণ করলো। এ সময়ে রোমের কিছু বিক্ষুব্ধ ক্রীতদাস ও ভাড়াটিয়া সৈন্য রোম প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছিল। প্রায় বিনা বাধায় এলারিক রোমে প্রবেশ করলো।

॥ ভ্যাণ্ডাল-নেতা জেনসেরিক্ ॥

এলারিকের মৃত্যুর পরে ভিসিগথেরা গল দেশে এবং স্পেনে প্রভুত্ব কায়েম করতে লাগলো। এর পরেই ভ্যাণ্ডাল নামে আর একটি জার্মান উপজাতি রোমের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিষ্ঠুরতায় ভ্যাণ্ডালেরা সকলকেই হারিয়ে দিয়েছিলো। নির্বিচারে নরহত্যা, লুণ্ঠন, প্রাসাদে প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি তাণ্ডবলীলায় রোম প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। ভ্যাণ্ডালদের নেতা ছিল জেনসেরিক্

বা গাইসেরিক্। এক সময়ে গাইসেরিক্ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রোমের আফ্রিকার সাম্রাজ্য দখল করে নিল।

এখন থেকে রোমের উপরে আক্রমণের কোনো বিরতি ছিল না। বার্গেণ্ডীয়, পূর্বগথ, আলমানি, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি জার্মান উপজাতিরা দলে দলে রোম-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ চালাতে লাগলো। যে-কোনো দস্যু-সর্দার কিছু সংখ্যক অনুচর সংগ্রহ করতে পারলেই লুঠতরাজের লোভে রোমের উপরে হানা দিত। স্যাক্সন, শ্লাভ্, আভার প্রভৃতি জার্মান উপজাতিরাও দলে দলে রোমের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রায় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রকার অরাজকতা চললো বিনা বিরতিতে।

॥ হূন্-নেতা এটিলা ॥

এই প্রকার অরাজকতার সময়ে আবার হূন্-নেতা এটিলার রণ-দামামা বেজে উঠলো। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এটিলা ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ধ্বংস ও লুটপাট করে গ্রীসে প্রবেশ করলো। তার ইটালী আক্রমণের আশংকায় এখানকার অধিবাসীরা ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লো। এক আশ্চর্যজনক অবস্থায় এটিলা রোম আক্রমণ না করে ফিরে গেল। কথিত আছে যে, রোমের পোপের ঐশ্বরিক শক্তিতে এটিলা ভীত হয়ে পড়ে এবং তাঁর নির্দেশেই তাকে ফিরে যেতে হয়। ৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়। এটিলা 'ঈশ্বরের অভিশাপ' নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছে। জার্মানী থেকে সুদূর এশিয়া পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এটিলার মৃত্যুর পরে তার সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

রোমের শাসন-ব্যবস্থা ও রোমান আইন

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে রোমের শাসন-ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে রোমান আইনের গুরুত্ব কোনো রকমেই অস্বীকার করা যায়

না। ইংরেজ আমলে আমাদের বিচার-বিভাগে কিছু কিছু রোমান আইন প্রবর্তিত হয়েছিল।

প্রথম থেকেই রোমের অধিবাসীরা রাজার শাসন পছন্দ করতেন না। তাঁরা ছিলেন সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী। শাসন-পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করতো 'সিনেট' নামে একটি পরিষদ। এই সিনেটের সদস্যেরা রোমের নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। কৃষকদের স্বাধীনতা রক্ষা ও তাদের ঋণ-মকুবের জন্য রোমের সিনেট অনেক আইন পাস করেছিল।

রোমের নাগরিকেরা তাঁদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে খুবই সচেতন থাকতেন। বিজিত প্রদেশের যোগ্য ব্যক্তিদের নাগরিকদের অধিকার দেওয়া হতো। রোমের নাগরিকত্ব অর্জন সে সময়ে খুবই গৌরবের ছিল। বিজিত প্রদেশের সর্বত্রই রোমের আইন প্রবর্তিত হয়েছিল।

॥ ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্য ॥

ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকার অংশবিশেষ এবং এশিয়া মহাদেশের কতকাংশ নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্য যখন গৌরবের উচ্চশিখরে পৌছেছিল, তখন চীনের হান্-সাম্রাজ্য এবং ভারতের গুপ্ত-সাম্রাজ্যও এক গৌরবের স্থান অধিকার করেছিল; কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে, যাতায়াতের পথ-ঘাট দুর্গম থাকাতে এই সব সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ছিল না বললেই হয়।

রোমের সাম্রাজ্যে এক ঐক্যবদ্ধ শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। সর্বত্রই রোমের আইন অনুসারে বিচার চলতো এবং রোমের শাসকেরা দূরবর্তী প্রদেশেও 'রোমের শান্তি' অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

জার্মান মানবগোষ্ঠী

রোমানরা আক্রমণকারী জার্মানদের বলতেন 'বর্বর'। রোমের জুলিয়াস সীজার এবং ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের লেখা থেকে জার্মান

মানবগোষ্ঠীর বিবরণ জানা যায়। জার্মানরা ছিল দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ। তাদের চুল ছিল তামাটে, চোখ নীলাভ। তাদের দাপটে রোম-সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

॥ সামাজিক জীবন ॥

জার্মানদের সমাজ ছিল চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত : সম্ভ্রান্ত, স্বাধীন জনসাধারণ, ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, স্যাকসন, অ্যাঙ্গল, জুট, লম্বার্ড, বার্গাণ্ডীয় প্রভৃতি উপজাতিতে জার্মানরা বিভক্ত থাকলেও সামাজিক সংগঠন মোটামুটি একই প্রকারের ছিল। জার্মান-সমাজে নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা লাভ করতো। গৃহস্থালির সব দায়িত্ব থাকতো মেয়েদের উপরে। তারা যেমন ছিল পরিশ্রমী, তেমনি সাহসী। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পুরুষেরা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতো।

॥ রাজনৈতিক জীবন ॥

জার্মানদের মধ্যে প্রথমে কোনো রাজা ছিল না। উপজাতীয় লোকেরা নিজেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতা বা দলপতি নির্বাচিত করতো। নেতা বা দলপতির প্রতি আনুগত্য, তাদের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। নেতার আদেশে মৃত্যুবরণ করাও সম্মানজনক মনে করা হতো।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলিই ছিল জার্মানদের বাসস্থান। প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে গ্রামগুলিতে জনবসতি গড়ে উঠতো। গ্রামগুলিকে সুরক্ষিত করা হতো চারপাশে পাথরের প্রাচীর নির্মাণ করে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গ্রাম গঠিত হতো। গ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে 'গ্রাম-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হতো; এই সমিতিগুলিই গ্রামের শাসন-পরিচালনা করতো। একশো জনের এক একটা দলে জার্মানরা বিভক্ত থাকতো। এইভাবেই 'হাণ্ড্রেডের' সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে

রোমানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা তাদের রাজনৈতিক সংগঠনকে আরও মজবুত করে তুলেছিল।

॥ ধর্মীয় জীবন ॥

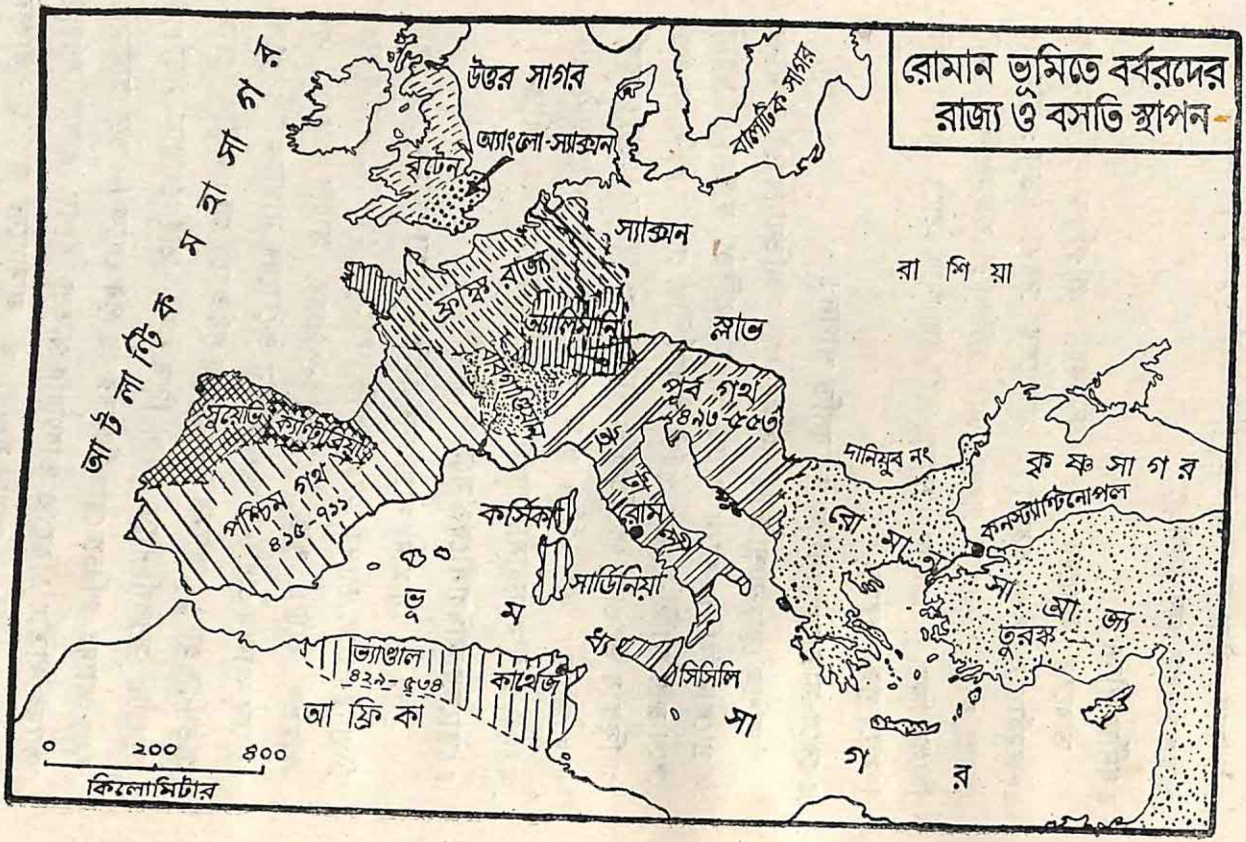
ভারতের আর্যদের মত জার্মানরা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে দেবদেবীরূপে পূজা করতো। আকাশের দেবতা ওড্ন; পৃথিবীর দেবতা হার্থা; বজ্রের দেবতা ডনর বা থর; সৃজনশক্তির দেবী ছিলেন ফ্রিয়া। জার্মানরা সূর্যকে দেবী সুন্না আর চন্দ্রকে দেবতা মানি হিসাবে পূজা করতো।

॥ রোম-সাম্রাজ্যে জার্মানদের বসতি স্থাপন ॥

পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতনের পরে অভিযানকারী জার্মানরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করলো। ফরাসী দেশে ফ্রাঙ্ক জাতি; তার পূর্বভাগে বার্গাণ্ডীয়, স্পেনে ভিসিগথ, উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডাল এবং ব্রিটেনে অ্যাঙ্গল্স ও স্যাক্সন প্রভৃতি বসতি গড়ে তোলে। এই জার্মান ও তাদের উপজাতীয় লোকেরাই কিন্তু বর্তমান জার্মান, ফরাসী, স্পেনিয়ার্ড ও ইংরেজ প্রভৃতির পূর্বপুরুষ।

॥ রোমের অধিবাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রণ ॥

রোম ও রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যে জার্মানদের বসতি বিস্তারের ফলে তাদের সঙ্গে অতি সহজেই রোমান নাগরিকদের সংমিশ্রণ ঘটে। খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, এবং ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জার্মান ও রোমের নাগরিকরা পরস্পর প্রভাবিত হয়। রোমের পতনের বহু পূর্ব হতেই বহু জার্মান রোম-সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তাই রোমান সভ্যতার সঙ্গে তাদের পরিচয় রোম-বিজয়ের বহু পূর্ব থেকে। তবে জার্মানরা তাদের জাতীয় চরিত্র ও ভাবধারার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করতো। রোমান-সভ্যতা ও জার্মানদের জাতীয় সভ্যতার মধ্যে সংহতি স্থাপিত হয়েছিল খ্রীস্টধর্মের প্রভাবে।


রোমান ভূমিতে বর্বরদের
রাজ্য ও বসতি স্থাপন
উত্তর সাগর
বাল্টিক সাগর
অ্যাংলো-স্যাক্সন
ব্রিটেন
স্যাক্সন
রা শি য়া
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
অ্যালিমানি
স্লাভ
পূর্ব গথ
৪৯৩-৫৫৩
দানিয়ুব নং
কৃ ষ্ণ সা গ র
কনস্ট্যান্টিনোপল
আ ট লা ন্টি ক ম হা সা গ র
সুয়েভি
ক্যান্টাব্রিয়া
পশ্চিম গথ
৪১৮-৭১১
কর্সিকা
রোম
সার্ডিনিয়া
রো মা ন সা ম্রা জ্য
তুরস্ক
ভূ ম ধ্য সা গ র
ভ্যাণ্ডাল
৪২৯-৫৩৪
কার্থেজ
সিসিলি
আ ফ্রি কা
০ ২০০ ৪০০
কিলোমিটার

॥ জার্মানদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ ॥

৩২৪ খ্রীস্টাব্দে রোম-সম্রাট কন্‌স্ট্যানটাইন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে এই ধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করেন। ৫৯০ খ্রীস্টাব্দে রোমের গ্রেগরী যখন পোপের পদ অলংকৃত করেন, সেই সময় থেকেই জার্মানদের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের জনপ্রিয়তা সবিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং জার্মান-দলপতি বা রাজাদের সঙ্গে তাঁদের অনুচরেরাও খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। সুদীর্ঘ চৌদ্দবছর গ্রেগরী পোপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই সমসাময়িক ইউরোপে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

জার্মানদের উপরে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তেজোদীপ্ত সাহসী জার্মানদের অন্তরে খ্রীস্টানদের শান্তির ধর্ম গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁদের উদ্দাম, উগ্র, হিংস্র, চঞ্চল প্রকৃতি খ্রীস্টধর্মের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে এক অপার্থিব বস্তুর সন্ধান লাভ করেছিল।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপে হূন্ আক্রমণ বর্ণনা কর।

২। রোমের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৩। জার্মান মানবগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৪। জার্মানরা কিভাবে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে?

৫। জেনসেরিক্ কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। রোমের সম্রাটেরা কতদিন রোমের শান্তি বজায় রেখেছিলেন?

২। হূনেরা দেখতে কেমন ছিল?

৩। হূন্‌দের প্রধান হাতিয়ার কি কি ছিল?

৪। হূন্‌দের আক্রমণে প্রথম কোন্ জাতি পরাজিত হয়?

৫। গথেরা কয়ভাগে বিভক্ত ছিল এবং কি কি?

৬। রোম্‌-সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের রাজধানীর নাম কি ছিল ?
৭। এলারিক কে ছিলেন ?
৮। এলারিক কার বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন ?
৯। এলারিকের সঙ্গে রোমের সরকারের সন্ধির শর্ত কি ছিল ?
১০। এলারিক কেন বিনা বাধায় রোমে প্রবেশ করেন ?
১১। ভ্যাণ্ডাল কারা ? তাদের কি বৈশিষ্ট্য ছিল ?
১২। ভিসিগথ ও ভ্যাণ্ডালরা ছাড়া আর কারা রোমের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল ?
১৩। এটিলা কেন রোম আক্রমণ না করে ফিরে যান ?
১৪। এটিলার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?
১৫। "সিনেট" সম্বন্ধে কি জান ?
১৬। রোমান সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?
১৭। জার্মান মানবগোষ্ঠীর বিবরণ কোথা থেকে জানা যায় ?
১৮। জার্মানদের সমাজ কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং কি কি ?
১৯। জার্মানরা কয়টি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল ?
২০। জার্মান সমাজে নারী জাতির স্থান কিরূপ ছিল ?
২১। জার্মানদের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ কি ছিল ?
২২। 'গ্রাম সমিতি' কি ? তাদের কি কাজ ছিল ?
২৩। 'হাণ্ডেড' কাকে বলে ?
২৪। জার্মানদের কয়েকটি বিখ্যাত দেব-দেবীর নাম কর।
২৫। রোমানদের সঙ্গে জার্মানদের কিভাবে সংমিশ্রণ হয় ?
২৬। জার্মানরা কিভাবে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বাঁদিকের বক্তব্যের সঙ্গে ডানদিকের বক্তব্যের মিল দেখাও :—

(ক) হুনদের আক্রমণে প্রথম পরাজিত হয়।	ওডন
(খ) রোমের পূর্বাংশের রাজধানী ছিল।	গথ
(গ) এলারিক বশ্যতা স্বীকার করেন।	জেনসেরিক্
(ঘ) ভ্যাণ্ডালদের নেতা ছিল।	কনস্ট্যান্টিনোপল
(ঙ) রোমানরা আক্রমণকারী জার্মানদের বলতেন।	গ্রেগরী

(চ) জার্মানদের নিকট আকাশের দেবতা ছিলেন। বর্বর

(ছ) ৫৯০ খ্রীস্টাব্দে রোমের পোপ হন। থিওডোসিয়াস

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) গথেরা দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল — ও পশ্চিম গথ।

(খ) — খ্রীস্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়।

(গ) এটিলা — — নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছে।

(ঘ) জার্মানদের নিকট সৃজনশক্তির দেবী ছিলেন —।

(ঙ) ৩২৪ খ্রীস্টাব্দে রোমে সম্রাট — খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

(চ) সুদীর্ঘ — বছর গ্রেগরি পোপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। রোমের শান্তি কত বৎসর বজায় ছিল ?

২। হূনেরা দেখতে কেমন ছিল ?

৩। হূনদের কয়েকটি প্রধান হাতিয়ারের নাম কর।

৪। পূর্ব ও পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানীর ন্যম কি ?

৫। এলারিক কে ? তিনি কার বশ্যতা স্বীকার করেন ?

৬। ভ্যাণ্ডাল কারা ? তাদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দাও।

৭। ভ্যাণ্ডালদের নেতার নাম কি ?

৮। এটিলা কে ছিলেন ?

৯। 'ঈশ্বরের অভিশাপ' কাকে বলা হয় ?

১০। এটিলার সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

১১। সিনেট কাকে বলে ?

১২। বর্বর কাদের বলা হতো ?

১৩। জার্মানরা দেখতে কেমন ছিল ?

১৪। গ্রাম-সমিতি কি ? ইহার কি কাজ ছিল ?

১৫। রোম সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন কবে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন ?

১৬। গ্রেগরী কত বছর পোপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ?

॥ ৩ ॥

অন্ধকার যুগ

চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের এই তিনশো বছরের ইতিহাস 'অন্ধকার যুগ' নামে পরিচিত।

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোম-সাম্রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিছু সময়ের মধ্যে হূন্-আক্রমণ ও জার্মান-আক্রমণের ফলে রোম-সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বিজয়ী জার্মানরাও পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় কোন শক্তিশালী সরকার গড়ে তোলা এ সময়ে সম্ভব ছিল না। কোনো জার্মান দলপতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হলেও নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারতো না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা এ সময়ে ছিল না। পথ-ঘাট ছিল দুর্গম। চোর-ডাকাতের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সর্বত্রই ছিল অরাজকতা ও নিরাপত্তার অভাব।

॥ সহযোগিতার পথ ॥

এই দুর্দিনে শাসক-শাসিতেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার পথ বেছে নিতে কিছুটা সমর্থ হয়েছিল। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এটা একটি শুভ লক্ষণ। এই সময়ে সামন্ত-ব্যবস্থার সূচনা হয়। এই প্রথার উৎপত্তির মূলে ছিল পরস্পর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা। জমির মালিক রাজা, তিনি সামরিক সাহায্য ও করের বিনিময়ে অনুগত সামন্তদের মধ্যে জমি বিলি-ব্যবস্থা করতেন। সামন্তদের অধীনে কৃষকেরা জমির চাষ-আবাদ করতো।

খ্রীস্টান-ধর্ম

জনজীবন যখন অনিশ্চিয়তা ও নিরাপত্তার অভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করছিল তখন খ্রীস্টান ধর্ম অনন্য দৃঢ়তায় দুর্ভেদ্য পাহাড়ের মত ছিল

অটল। সম্রাট ডায়োক্লিটিয়ান খ্রীস্টানদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিলেন। কিন্তু সেণ্ট পলের ন্যায় ধর্মপ্রচারকের দৃষ্টান্তে সে যুগের খ্রীস্টানেরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন অনড়। সেণ্ট পিটার হলেন রোমের প্রথম বিশপ।

খ্রীস্টান ধর্মের শিক্ষা ছিল সত্য ও যথার্থ ন্যায়কে আশ্রয় করে চলা; অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সত্য ও ন্যায়পথে চলার শিক্ষা দিতেন ধর্মপ্রচারকেরা। সকল জীবের পিতা ঈশ্বরকে ভালবাস, সকলে তোমরা ভাই-ভাই; ধনী-দরিদ্র সকলেই প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারবে; মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে হবে। কাজে, কথায় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের নীতি মেনে চলবে। এর বিরুদ্ধে যাওয়াই অন্যায়, অপরাধ। শেষ বিচারের দিনে অপরাধীকে পেতে হবে কঠোর শাস্তি। গির্জাগুলিতে এই ভাবে চলতো ধর্মচর্চা।

॥ অন্ধকার যুগ নয় ॥

অনেক ঐতিহাসিক এই সময়ের ইতিহাসের নানা তথ্যাদি উপস্থিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এই সময়ের ইতিহাসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা ঠিক হবে না। ইতিহাসের গতি তখনও চলমান ছিল—স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এই যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা পরবর্তীকালে ইউরোপবাসীকে উন্নতির পথে যেতে উৎসাহিত করেছিল। পরবর্তী উন্নত ইউরোপীয় সভ্যতার অনেক শুভ লক্ষণের সূচনা এ সময়ে হয়েছিল। প্রভাতী তারার ঝলক যেমন ঊষার আবির্ভাবের সূচনা করে তেমনি এ যুগেও আলোর ঝিকিমিকি দেখে মনে হবে যে অন্ধকারের পর্দা শীঘ্রই খসে পড়বে।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ' কোন্ সময়কে বলা হয় ?
২। খ্রীস্টান ধর্মের কি শিক্ষা ছিল ?
৩। 'অন্ধকার যুগ' অন্ধকার নয় কেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোম-সাম্রাজ্য কয়টি ভাগে বিভক্ত হয় ?
২। এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য কিরূপ ছিল ?
৩। এই সময়ে সামন্ত-ব্যবস্থার উন্নতির মূলে কি ছিল ?
৪। কোন্ সম্রাট খ্রীস্টানদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিলেন ?
৫। কিভাবে রোম-সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?
৬। রোমের প্রথম বিশপ কে ছিলেন ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বন্ধনীর মধ্যস্থিত শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখ :—

(ক) সামন্ত ব্যবস্থার সূচনাতে জমির মালিক ছিলেন—(রাজা, জমিদার, প্রজা)।

(খ) সে-যুগের একজন ধর্মপ্রচারকের নাম—(সেণ্ট টমাস, সেণ্ট পল, সেণ্ট ম্যাথুজ)।

(গ) রোমের প্রথম বিশপ হলেন—(যীশু, সেণ্ট পিটার, সেণ্ট টমাস)।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। অন্ধকার যুগ কোন্ সময়কে বলা হয় ?
২। কোন্ সম্রাট খ্রীস্টানদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিলেন ?
৩। খ্রীস্টান ধর্মের শিক্ষা কি ছিল ?

॥ ৪ ॥

বাইজাণ্টাইন সভ্যতা

বাইজান্টিয়াম্ ছিল কৃষ্ণসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি গ্রীক উপনিবেশ। পরবর্তী সময়ে এই নগরটি রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এই নগরটির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই নগরটি ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের সেতু স্বরূপ। পূর্ব ও পশ্চিমের ভাবধারা বিনিময় হতো এখান থেকেই।

রোম সম্রাট কন্স্ট্যাণ্টাইন (৩২৩-৩৫১ খ্রী.) যখন এখানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, তখন থেকে এর নতুন নাম হয় **কন্স্ট্যাণ্টিনোপল**। এই নগরের বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল।

যখন রোমের উপরে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তখনই সম্রাট কন্স্টাণ্টাইন এই সুরক্ষিত অঞ্চলে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন (৩৩০ খ্রী.)। সম্রাট নিজে যখন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলেন তখন এখানেও খ্রীস্টান ধর্মের প্রসার হয়। অনেক গির্জাও নির্মিত হতে থাকে। এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন গ্রীক ভাষা-ভাষী।

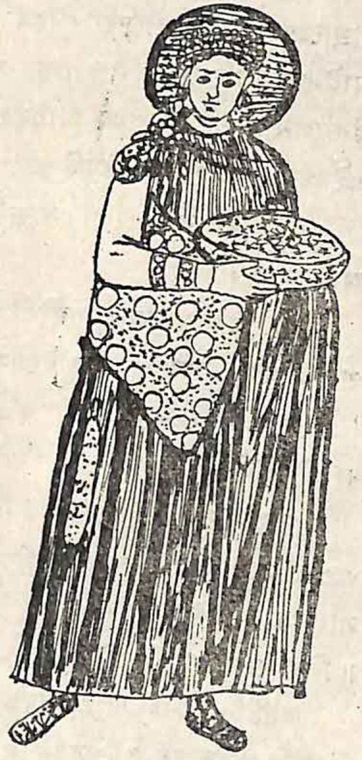
রোম-সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয় ৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে। সম্রাট থিয়োডো-সিয়াস তাঁর এক পুত্র হনরিয়াসকে দিলেন পশ্চিম সাম্রাজ্য, আর এক পুত্র আর্কেডিয়াসকে দিলেন পূর্ব সাম্রাজ্য। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতন হয়।

জার্মান উপজাতীয় আক্রমণে যখন পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন পূর্বাংশের সম্রাটেরাই রোমের ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন। সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বল্কান অঞ্চল নিয়ে বিশাল বাইজাণ্টাইন বা পূর্ব রোম-সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।


রোম সাম্রাজ্যের বিভাগ
ইংল্যাণ্ড
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
গল
আটলান্টিক মহাসাগর
স্পেন
কর্সিকা
রোম
সার্দিনিয়া
ইতালি
সিসিলি
ভূমধ্য সাগর
দানিয়ুব নং
কৃষ্ণ সাগর
কন্সটান্টিনোপল
তুরস্ক
কাস্পিয়ান সাগর
পারস্য
টাইগ্রিস নং
ইউফ্রেটিস নং
কার্থেজ
আফ্রিকা
মিশর
নীলনদ
লোহিত সাগর
আরব
কাল্পনিক রেখার সাহায্যে
সাম্রাজ্যের ভাগ দেখান হইল
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য
পূর্ব ,, ,,

সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৫৬৫ খ্রী.)

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট জাস্টিনিয়ান একটি কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দোষগুণের সমন্বয়ে এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। একদিকে বুদ্ধিমান, অক্লান্তকর্মী এবং অসীম সাহসী; অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারী, বিলাসী, লোভী এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতির ছিলেন এই সম্রাট। থিয়োডোরা নামে এক রমণীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। অভিনেত্রী হিসাবে এই নারী জীবন শুরু করেছিলেন; কিন্তু বহুগুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। জাস্টিনিয়ানের ভাগ্য ছিল তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন। বেলিসেরিয়াসের মত একজন বিচক্ষণ সমর-নেতাকে তিনি সেনাপতি হিসাবে পেয়েছিলেন।



সম্রাট জাস্টিনিয়ান

দুর্দান্ত ভ্যাণ্ডালদের পরাজিত করে তিনি উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেন। পূর্ব গথদের বিতাড়িত করে তিনি ইটালী পুনরুদ্ধার করেন। পশ্চিম গথদের পরাজিত করে তিনি স্পেনের দক্ষিণাংশ দখল করেন। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশ তিনি উদ্ধার করতে পারেননি সত্য, কিন্তু জার্মান বর্বরদের উপরে তিনি কঠোর প্রতিহিংসা নিয়েছিলেন। পশ্চিমে প্রায় সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়োগ করার ফলে জাস্টিনিয়ান পারসিকদের বিরুদ্ধে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। তবে একথা সত্য যে, পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যে তিনি রাজনৈতিক ঐক্য সুদৃঢ় করেছিলেন।

॥ জাস্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা ॥

জাস্টিনিয়ানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো 'কর্পাস্ জুরিস্' বা রোমীয় আইন-সংহিতা। বহু শতাব্দী অক্লান্ত পরিশ্রম করে রোমের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অনেক আইন প্রস্তুত করেছিলেন। এই আইনগুলি রোমের নাগরিকদের এবং পরবর্তী সময়ে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছিল। জাস্টিনিয়ান আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে আইনগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করালেন। এই লিপিবদ্ধ আইনগুলিই জাস্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা। এই আইন-সংহিতাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত :

(ক) মূল সংহিতা বা কোড্। 'কোডে' রয়েছে সম্রাটদের তৈরি আইনসমূহ।

(খ) রোমের ব্যবহারজীবী ও আইনজ্ঞদের দ্বারা লিখিত আইন-গুলির একটি সঙ্কলন বা 'ডাইজেস্ট'।

(গ) আইনসমূহ কিভাবে এবং কেন রচিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা বা 'ইন্স্টিটিউট'।

পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে যখনই আইন রচনার প্রশ্ন উঠেছে, মূল উপকরণ হিসাবে জাস্টিনিয়ানের আইন-সংহিতার সাহায্য তখনই নিতে হয়েছে।

॥ শিল্প ও ভাস্কর্যের শ্রীবৃদ্ধি ॥

জাস্টিনিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় কন্স্ট্যান্টিনোপল জাঁকজমক, বিলাসিতা, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুরক্ষিত এই নগরটিকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিধ্বস্ত করা সহজ ছিল না; এখানে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকার ফলে নগরটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে তোলার অবকাশ ছিল। সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ, সুন্দর সুন্দর প্রমোদ-উদ্যান, অভিজাতদের মনোরম প্রাসাদসমূহ এবং মার্বেল ও সোনারূপার কাজ করা বড় বড় গির্জা নগরটিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। নগরটিকে সুরক্ষিত করার জন্য বড় বড় কেল্লা, চলা-

চলের সুবিধার জন্য বড় বড় সেতু নির্মিত হইয়াছিল। সবচেয়ে বড় গির্জাটির নাম ছিল সেণ্ট সোফিয়া গির্জা। মোজেইক ছিল প্রধান শিল্প। কোনো সুন্দর জিনিস এখানে তৈরি করতে হলে তা সোনা-রূপা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে সাজানো হতো। সেণ্ট সোফিয়ার মোজেইকের কাজগুলি ছিল খুবই বিস্ময়কর।

এখানকার অধিবাসীদের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা প্রভৃতিতে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করার মত। তারা রোমের পোপের কর্তৃত্ব মানতো না। পোপের কর্তৃত্ব যারা মানতো, তাদের বলা হতো 'ল্যাটিন খ্রীস্টান' আর যারা তা স্বীকার করতো না তাদের বলা হতো **'গ্রীক খ্রীস্টান'**। কনস্ট্যান্টিনোপলে গ্রীক চার্চের প্রভাব বেশি ছিল।

॥ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ॥

কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অবস্থিত কনস্ট্যান্টিনোপল শীঘ্রই ইউরোপ ও এশিয়ার একটি বিখ্যাত ব্যাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। লোহিত সাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে সাধারণত জলপথে বাণিজ্য চলতো। কিন্তু জলপথ ছিল খুবই দুর্গম, তাই স্থল-পথেই বেশির ভাগ আমদানি-রপ্তানি চলতো। মিশরের মধ্য দিয়ে ইথিওপিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। চীনের রেশম, ভারতের রকমারি বিলাসসামগ্রী, সিংহলের মুক্তা—এসব ছিল প্রধান বাণিজ্য পণ্য। রেশম তৈরির জন্য চীনদেশ থেকে গোপনে গুটি পোকার ডিম আমদানি করা হতো। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া তখনও একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

॥ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ॥

চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম থেকেই জনজীবনে এক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের চর্চা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিঃশঙ্কচিত্ত না হলে দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বাধীন চিন্তা ও সাহিত্যে

সুন্দরের আরাধনা সম্ভব হয় না। চিন্তার খোরাক সে-যুগে যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল খ্রীস্টান ধর্মের কল্যাণে।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পর সাম্রাজ্যের শান্তি পুনরুদ্ধার করেন এবং শিক্ষার অনুশীলনের জন্য কনস্ট্যান্টিনোপলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি এথেন্সের বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই সময়েই গ্রীক পণ্ডিতদের চেষ্টায় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। অ্যারিস্টট্‌লের দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে পণ্ডিতদের পুনরায় পরিচয় ঘটে। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই দার্শনিকের বিখ্যাত গ্রন্থ **বিশ্বকোষের** (এনসাইক্লোপিডিয়া) পুনরুদ্ধারে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পূর্ণভাবে সফল হন নাই।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

২। জাস্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা বলতে কি বোঝ?

৩। জাস্টিনিয়ানের আমলে শিল্প ও ভাস্কর্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে কি জান?

৪। বাইজাণ্টাইন-সভ্যতার যুগে ব্যবসা ও বাণিজ্যের কিরূপ প্রসার হয়েছিল?

৫। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি গ্রীক উপনিবেশের নাম কর।

২। বাইজাণ্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থানের কি গুরুত্ব ছিল?

৩। কনস্ট্যাণ্টাইন কোথায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন?

৪। রোম-সাম্রাজ্য কবে এবং কিভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়?

৫। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্য কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল?

৬। জাস্টিনিয়ানের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন বলা হয়েছিল কেন?

৭। বেলিসেরিয়াস কে? তিনি জাস্টিনিয়ানকে কিরূপে সাহায্য করেন?

৮। জাষ্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা কি?
৯। জাষ্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা কয়ভাগে বিভক্ত এবং কি কি?
১০। সেণ্ট সোফিয়া গির্জার সৌন্দর্য বর্ণনা কর।
১১। ল্যাটিন খ্রীস্টান ও গ্রীক খ্রীস্টান কাদের বলা হতো?
১২। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কেমন ছিল?
১৩। সম্রাট জাষ্টিনিয়ান শিক্ষার জন্য কি করেন?
১৪। বিশ্বকোষ কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বাঁদিকের উক্তির সঙ্গে ডানদিকের উক্তি মেলাও :

(ক) ৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে	বেলিসেরিয়াস
(খ) ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে	পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতন হয়
(গ) কনস্ট্যাণ্টিনোপলের বর্তমান নাম	মোজেইক
(ঘ) জাষ্টিনিয়ানের সেনাপতির নাম ছিল	রোম সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়
(ঙ) পোপের কর্তৃত্ব যারা মানতো না তাদের বলা হতো	ইস্তাম্বুল
(চ) সেণ্ট সোফিয়ার কোন্ কাজ ছিল বিস্ময়কর	'গ্রীক খ্রীস্টান'
(ছ) ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে	কনস্ট্যাণ্টাইন তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। বাইজাণ্টিয়াম কোথায় অবস্থিত ছিল?
২। কনস্ট্যাণ্টাইনের নতুন রাজানীর নাম কি ছিল?
৩। রোম-সাম্রাজ্য কবে দ্বিখণ্ডিত হয়?
৪। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্য কবে ধ্বংস হয়?
৫। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?
৬। থিওডোরা কে ছিলেন?
৭। বেলিসিরিয়াস কে ছিলেন?
৮। রোমীয় আইন-সংহিতা কাকে বলে?
৯। রোমীয় আইন-সংহিতা কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?
১০। কনস্ট্যাণ্টিনোপল নগরটিকে সুরক্ষিত করবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল?
১১। কনস্ট্যাণ্টিনোপলের সবচেয়ে বড় গির্জার নাম কি ছিল?
১২। মিশরের একটি বাণিজ্য-কেন্দ্রের নাম কর।

॥ ৫ ॥

ইসলামীয় সভ্যতা

ইসলামীয় সভ্যতার সূচনা হয় আরব দেশে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। মরুভূমির দেশ আরব। সেখানে সবুজ শ্যামলের সন্ধানে খুঁজতে হবে মরূদ্যান; তার সংখ্যাও ছিল বিরল এবং সেসব খুঁজে নিতে হলে ছুটাছুটি করতে হবে মরীচিকার পিছনে। আরবদেশে সর্বদাই দেহ-ঝলসানো খরা। তাই রাতের শীতল স্পর্শের জন্য আরবীয়রা ব্যাকুল হতো। চাঁদ দেখে তাদের মন আনন্দে ভরে উঠতো। তাদের ধর্ম-উৎসব, কাব্য-কবিতা, দর্শন-বিজ্ঞান সবই চাঁদকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের মাত্র শতবর্ষ পূর্বে রোম-সাম্রাজ্য ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন ঘটেছে। ইউরোপে চলছিল তখন ঘোর অরাজকতা। বাইজান্টাইন ও পারস্যদেশের সম্রাটেরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একমাত্র চীনের তাঙ্ বংশীয় সম্রাটেরা ছিলেন মোটামুটি শক্তিশালী।

।। আরবের অধিবাসী ।।

মহম্মদের অবির্ভাবের সময়ে আরবের অধিবাসীরা কয়েকটি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। উপজাতির নেতাকে বলা হতো 'শেখ'। তারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—'সারবানী' ও 'মরুবানী' বা 'বেদুইন'। বেদুইনেরা ছিল যাযাবর। তারা উটের পিঠে চড়ে মরুভূমিতে তাদের পরিবার ও পশুগুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। পশু-চারণের ক্ষেত্র পেলে সেখানে তাঁবু ফেলে কিছুদিন বাস করতো। পরে আবার বেরিয়ে পড়তো নতুন চারণ-ভূমির সন্ধানে। পশুপালন ও লুঠপাট করে তারা দিন কাটাতো। খেজুর ও পশুর মাংস ছিল তাদের খাদ্য। বিভিন্ন উপজাতির শেখেরা নিজেদের দলের সম্মান

ও স্বার্থরক্ষার জন্য অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। বেদুইনেরা ছিল সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও যুদ্ধ-নিপুণ।

আরবীয়রা মূর্তিপূজা করতো। প্রত্যেক উপজাতি নিজেদের বিশ্বাস মত বিভিন্ন দেবতার পূজো করতো। মক্কায় ছিল কাবা-মন্দির। 'কাবা' শব্দের অর্থ চৌকো জিনিস। কাবা-মন্দিরের একখণ্ড কালো পাথর আরবীয়দের প্রধান দেবতা ছিল। মক্কাই ছিল তাদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। বসন্তকালকে তারা খুব পবিত্র মনে করতো। এই সময়ে তারা সব শত্রুতা ভুলে গিয়ে মক্কায় উপস্থিত হতো। সেখানে ঐ সময়ে মেলা বসতো এবং কাবা-মন্দিরে পূজোর উৎসব জমে উঠতো।

আরবীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব পটু ছিল। মক্কা ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। তারা নিরক্ষর ছিল, কিন্তু গান করতে ও মুখে মুখে কবিতা রচনা করে তারা আনন্দ পেতো। গান ও কবিতার বিষয় হতো জাতীয় গৌরবের নানা বিস্ময়কর কাহিনী।

হজরত মহম্মদ

মক্কা নগরে ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লা ও মাতার নাম আমিনা। আবদুল্লা ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত কোরেশী বংশের সন্তান। মহম্মদের জন্মের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আবদুল্লার মৃত্যু হয়। মাত্র ছ'বছর বয়সে তিনি মাকে হারালেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে প্রথমে পিতামহ আবদুল মুতালিবের উপরে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে পিতৃব্য আবুতালিবের উপর বালকের প্রতিপালনের ভার পড়ে। বাল্যে অভাব-অনটনের জন্য পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে মহম্মদকে পশু চরাতে হতো। সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্যও তিনি করতেন। মহম্মদ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছিলেন। এই সময়ে তিনি খাদিজা নামে এক বর্ষীয়সী মহিলার কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে

মহম্মদের সৎ ও নির্লোভ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা তাঁকে বিবাহ করেন।

মহম্মদ ছিলেন কোমল স্বভাব ও মিষ্টভাষী। পরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠতো। ধীরে ধীরে মহম্মদের ধর্ম-চেতনার উন্মেষ হতে থাকে। এই সময়ে একদিন রাতে একটি পর্বত-গুহায় প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। ঈশ্বর বা আল্লা তাঁকে বলছেন, তুমিই পৃথিবীতে আমার দূত। এই ঐশ্বরিক বাণীর কথা তিনি খাদিজার কাছে বর্ণনা করেন। খাদিজা তাঁকে উৎসাহিত করেন এবং 'আল্লার দূত' হিসাবে পৃথিবীতে তাঁর বাণী প্রচার করতে বলেন।

॥ ধর্মগ্রন্থ কোরান ॥

মহম্মদ নিজেকে আল্লার দূত বা পয়গম্বর নামে সকলের কাছে প্রচার করতে থাকেন। সম্ভবতঃ তিনি নিরক্ষর হওয়ায় তাঁর সমস্ত বাণী সহযোগী বন্ধুরা গাছের পাতায়, শ্লেটের টুক্‌রায় বা ভেড়ার কাঁধের চওড়া হাড়ের উপরে লিখে নিতেন। এই লেখাগুলিই পরে 'কোরান' নামে প্রকাশিত হয়।

কোরান শব্দের অর্থ গ্রন্থ—ধর্মের নীতি-সম্বলিত গ্রন্থ। মহম্মদের বাণী কোরানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোরান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। ইসলাম ধর্মানুসারে, আল্লাই হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর এবং মহম্মদ তাঁর একমাত্র দূত ও বাণীবাহক। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বের সকলের কাছে ইসলামের দ্বার মুক্ত। ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তিদের বলা হয় মুসলমান। প্রত্যেক মুসলমানের পাঁচটি প্রাথমিক কর্তব্য আছে—(ক) তাকে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে হবে; (খ) প্রত্যহ পাঁচবার প্রার্থনা করতে হবে; (গ) প্রার্থীদের অবশ্যই কিছু দান করতে হবে; (ঘ) উপবাস-বিধি বা রমজান পালন করতে হবে; (ঙ) জীবনে অন্ততপক্ষে একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে হবে।

এই পাঁচটি বিধি পালনই ইসলাম ধর্মের মূল কথা। এই পাঁচটি

বিধি, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ-বিশেষ। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয়, সব মানুষ সমান ও পরস্পরে ভাই ভাই।

॥ মহম্মদের ধর্মপ্রচার ॥

মহম্মদের নতুন ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করেন স্ত্রী খাদিজা, বন্ধু আবুবকর, পিতৃব্য আবুতালিবের পুত্র আলি, পালিত পুত্র জাইদ, ওমর, হামজা ও ওস্মান। ইসলামের প্রচারে মহম্মদকে প্রবলবেগে বাধা দিয়েছিল মক্কাবাসীরা। তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল। মহম্মদ এই বিপদে আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে এক অজ্ঞাত গুহায় তুদিন লুকিয়ে থাকেন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় তুটি উট সংগ্রহ করে তাঁরা তুজনে মদিনায় যাত্রা করেন। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে ২রা জুলাই তাঁরা মদিনা পৌঁছান। মক্কা থেকে মদিনা যাত্রাকে বলা হয় 'হিজরত' বা 'হিজরা'। এই হিজরা থেকেই মুসলমানী বর্ষ হিসাব করা হয়।

ইসলামের প্রচারের প্রথম দিকে মহম্মদ যখন নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, আবুবকর অপূর্ব নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা নিয়ে মহম্মদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অন্য শিষ্য আলি, মদিনায় মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। মদিনাবাসীরা মহম্মদের নবধর্মে দীক্ষিত হন, মদিনা হলো ধর্মগুরুর নগর। ক্রুদ্ধ মক্কাবাসীরা মদিনা আক্রমণ করে পরাজিত হয়। অবশেষে মহম্মদ মক্কা আক্রমণ স্থির করেন। বিশাল বাহিনীসহ মহম্মদের অগ্রগতিতে ভীত হয়ে মক্কাবাসীরা পরাজয় স্বীকার করলো। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়ী মহম্মদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। ধীরে ধীরে তিনি সমস্ত আরব দেশের ধর্মগুরু হিসাবে স্বীকৃত হন। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে ৮ই জুন সোমবার দ্বিপ্রহরে প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি দেহত্যাগ করেন।

॥ খলিফাদের নেতৃত্ব ॥

মহম্মদ মৃত্যুর পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর প্রবর্তিত ইসলামের মহান্ বাণী যেন পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে ইসলামের প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 'খলিফা' বা পরবর্তী

ধর্মনেতা। 'খলিফা' বা উত্তরাধিকারী হলেন পৃথিবীতে মহম্মদের প্রতিনিধি। প্রথমে 'খলিফা'-পদে অধিষ্ঠিত হলেন মহম্মদের প্রধান শিষ্য আবুবকর। তিনি সর্বদাই মহম্মদের নির্দেশসমূহ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে আবুবকর ছিলেন ইস্‌লামের আত্মাস্বরূপ।

মৃত্যুর পূর্বে আবুবকর মহম্মদের আর একজন শিষ্য ওমরকে খলিফা-পদের জন্য মনোনীত করে যান। ওমর অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। কথিত আছে যে, পারস্যের এক রাজপুরুষ ওমরের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেন যে, খলিফা ওমর মদিনার এক মসজিদের সিঁড়িতে একদল ভিখারীর সঙ্গে ঘুমিয়ে আছেন।

ওমরের পরে খলিফা নির্বাচিত হন ওসমান এবং ওসমানের পরে আলি। আলি ছিলেন মহম্মদের খুড়তুত ভাই ও জামাতা।

॥ খলিফাপদে দলাদলি ॥

খলিফাপদে আলির নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এই পদ নিয়ে আরবদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। সিরিয়ার শাসক মুয়াবিয়ার চক্রান্তে আলি নিহত হন। আলির মত একজন সর্বগুণ-সম্পন্ন মানুষ ইসলামের ইতিহাসে বিরল।

আলির মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান খলিফা-পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু মুয়াবিয়ার চক্রান্তে তিনি খলিফা-পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তাঁকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হয়। মুয়াবিয়া খলিফা-পদে অধিষ্ঠিত হন। হাসান খলিফা-পদ ছেড়ে দিলেন একটি শর্তে যে, মুয়াবিয়ার পরে হাসানের ছোট ভাই হুসেন খলিফা-পদে বৃত হবেন। মুয়াবিয়া এই চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং নিজ পুত্র এজিদকে খলিফা-পদে মনোনীত করেন। কিন্তু এজিদ ছিল এ পদে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

॥ কারবালার করুণ কাহিনী ॥

এজিদের চক্রান্তে কারবালার মরুপ্রান্তরে হুসেন, তাঁর পরিবারস্থ সকলে এবং অনুচরেরা নৃশংসভাবে নিহত হন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে স্মরণ করে মুসলমানেরা 'মহরম' পালন করে থাকেন। কারবালা প্রান্তরে এই ঘটনা ঘটে ৬৮০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে।

এই শোচনীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা 'শিয়া' ও 'সুন্নী' দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। 'শিয়া'-সম্প্রদায় আলি ও তাঁর বংশধরেরা খলিফা-পদ সমর্থন করে, আর 'সুন্নী'-সম্প্রদায় মুয়াবিয়া ও তাঁর বংশের সমর্থক। মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম উমায়া বংশ। তাঁর পূর্বপুরুষ উমায়ার নাম থেকে এই বংশের উৎপত্তি হয়।

॥ আরবীয় সাম্রাজ্য ॥

আরবীয় সাম্রাজ্যের অগ্রগতি আরম্ভ হয় আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের সময় থেকে। উমায়া বংশের পতনের পরে মহম্মদের অন্যতম পিতৃব্য আব্বাসের এক বংশধর খলিফা-পদ লাভ করেন (৭৫০ খ্রী.)। আব্বাসের নাম অনুসারে এই বংশের নাম হয় আব্বাসীয় বংশ।

এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা হারুন-অল্-রসিদ (৭৮৬ খ্রী.) ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী ছিল বাগদাদ। হারুন-অল্-রসিদ সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তিনি প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে বাগদাদের পথে-ঘাটে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। কর্মচারীদের প্রত্যেকটি কাজের খোঁজখবর নিতেন স্বয়ং খলিফা। সামরিক ব্যবস্থা উন্নত ছিল। খলিফা নিজেও ছিলেন সমরনিপুণ। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন; নিজে কর্তব্যপরায়ণ ও মিতাচারী হলেও দরবারে সবরকম বিলাসের উপকরণ সজ্জিত থাকতো। তাঁর

দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হয়েছিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের রানী আইরীন এবং সম্রাট শার্লেমেন তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

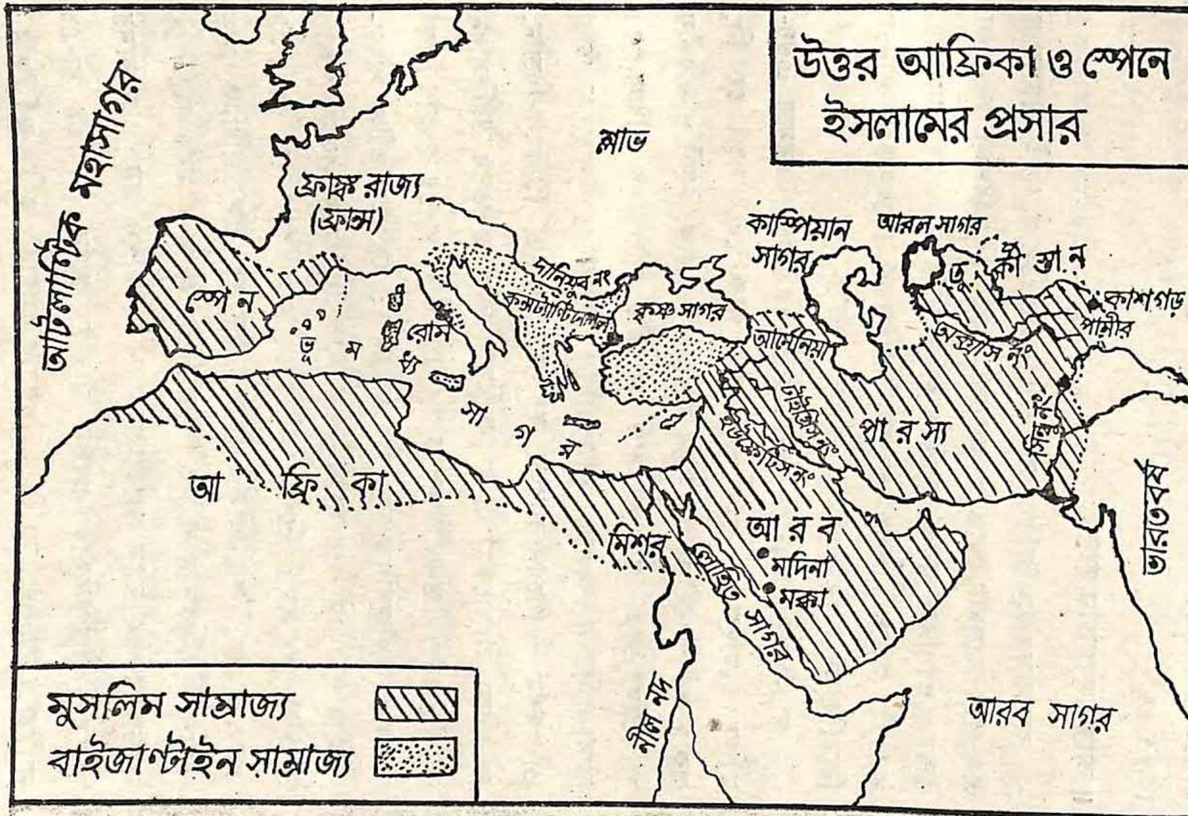
স্পেনে আরবীয় সাম্রাজ্য

আব্বাসীয় খলিফাদের সময়ে ইউরোপের স্পেন দেশে আরবীয় প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। মরক্কোর 'মরতেনিয়া' অঞ্চল থেকে এই আরবীয়রা স্পেনে এসেছিলেন বলে তাঁদের 'মূর' বলা হয়।

আরব-অধিকৃত স্পেনের রাজধানী ছিল কর্ডোভা নগর। কর্ডোভা তখন ছিল আরব-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। শিল্পে ও কারিগরি বিদ্যায় মূরেরা বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল। জনসাধারণের জন্য স্নানাগার, মসজিদ, প্রস্তর-বাঁধানো রাজপথ, মনোরম উদ্যান প্রভৃতি মূরদের কীর্তির পরিচয় দেয়। কর্ডোভার মার্বেল-নির্মিত প্রাসাদসমূহ ছিল এক আকর্ষণের বস্তু। গ্রন্থাগারে পণ্ডিতদের বহু গ্রন্থসমূহ শোভা পেত; এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র।

অ্যারাবেস্ক বা আরবীয় নামে এক নতুন শিল্পরীতি এখানে গড়ে ওঠে। মূর শিল্পীরা গাছের পাতা, ফুল, নানা প্রকারের জ্যামিতিক গঠন ও রেখাচিত্রের সাহায্যে এক মনোরম চারুশিল্পের সৃষ্টি করেন।

পীরানীজ পর্বত অতিক্রম করে ফরাসী দেশে মুসলমান অভিযান প্রতিহত হয় ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে। ইউরোপের কেন্দ্রভূমিতে তাই ইসলামের প্রচার সম্ভব হয়নি। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের কনস্ট্যান্টিনোপল তখনও ইসলামের পদানত হয়নি বটে; কিন্তু বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এক বিশাল অংশ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। এই প্রকারে স্পেন, উত্তর আফ্রিকার মিশরসহ এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ, ক্রীট, সাইপ্রাস্, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, আর্মেনিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, তুর্কীস্থান, বেলুচিস্থান এবং


উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে
ইসলামের প্রসার
আটলান্টিক মহাসাগর
স্লাভ
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
(ফ্রান্স)
স্পেন
রোম
দানিয়ুব নং
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান
সাগর
আরল সাগর
তুর্কীস্তান
কাশগড়
পামীর
আর্মেনিয়া
অক্সাস নং
টাইগ্রিস নং
ইউফ্রেটিস নং
পারস্য
সিন্ধু নং
ভূ ম ধ্য সা গ র
আ ফ্রি কা
মিশর
আরব
মদিনা
মক্কা
লোহিত সাগর
নীল নদ
আরব সাগর
ভারতবর্ষ
মুসলিম সাম্রাজ্য
বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য

ভারতের সিন্ধু অঞ্চল ব্যাপী এক বিরাট ভূভাগে আরবীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

॥ আরব সভ্যতার দান ॥

আরবদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না, তাই দামাস্কাস এবং পরে বাগদাদ থেকে খলিফাদের পক্ষে এই বিশাল সাম্রাজ্যে উত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নি। মূর শাসকেরা পরবর্তী সময়ে শাসন-ব্যবস্থায় অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আরবীয়দের অবদানে সভ্যতার বিভিন্ন ভাণ্ডার এসময়ে ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হয়েছিল। গ্রীক পণ্ডিতদের পক্ষে যেটা সম্ভব হয় নি, মরুদেশের আরবীয়রা তা সম্ভব করেছিল। গ্রীক, ইহুদী ও ভারতীয় পণ্ডিতদের লেখা গ্রন্থাদির সঙ্গে আরবীয় পণ্ডিতদের পরিচয় হয়। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। অনুদানের সাহায্যে তাঁরা গ্রীকদর্শন ও বিজ্ঞানকে রক্ষা করলেন; গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, অ্যালকেমী বা রসায়নবিদ্যায় তাঁরা অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করেছিলেন। ভারতীয়দের কাছ থেকে তাঁরা শূন্যের ব্যবহার শিক্ষা করলেন; বীজগণিত তাঁদেরই আবিষ্কার; রোমীয় জটিল সংখ্যা-গণনার পরিবর্তন করে আরবীয় পদ্ধতিতে তাঁরা সরল গণনা পদ্ধতি প্রবর্তিত করলেন। প্রথমে আরবদের ধারণা ছিল যে, কোরানই একমাত্র গ্রন্থ; কিন্তু বিজিত দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের মানসিকতায় অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। নবম শতাব্দীতে কর্ডোভায় এই নতুন ভাবধারা সম্যক বিকশিত হয়। রসায়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন তাঁরাই করেন। বিভিন্ন রং-এর সংমিশ্রণে নতুন রং আবিষ্কার, চশমার ব্যবহার, কৃত্রিম স্বর্ণ তৈরি; দেহে বার্ধক্যের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নানা হেকিমী ওষুধের ব্যবহারে আরবরা পথিকৃৎ; পরবর্তীকালে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা

আরবীয় পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করে নতুন বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেনা।

॥ কয়েকজন আরবীয় পণ্ডিত ॥

আব্বাসী-বংশীয় খলিফা অল্-মামুন 'বায়ত-অল-হিক্‌মা' বা জ্ঞান-পীঠ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখানে একটি গ্রন্থাগার ছিল ও নানা বিষয় পঠন-পাঠনের সুযোগ ছিল। সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি অনুবাদ বিভাগ। গ্রীকদর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির অনুবাদ এখানে করা হতো। পণ্ডিত হুনায়িন্-ইবন্-ইসাক্ ছিলেন এই যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ।

ইবন্-সিন্না ছিলেন আর একজন প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অল্-রজির নামও উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম হাম্ ও বসন্তরোগের চিকিৎসার নানা ওষুধ বের করেন। আহম্মদ-অল্-বিরুনীর নাম ভারতেও বিখ্যাত। তাঁর লেখা 'তারিখ-অল্-হিন্দ' বা ভারতের ইতিহাস একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক জীবনের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন ভারত-ভ্রমণ করার পরে। অল্-তবারি, ইবন্-বতুতা, ইবন্-রুশ্‌দ্ প্রভৃতি প্রতিভাবান ব্যক্তিদের নামও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। ইবন্-সিন্না তাঁর আত্মজীবনীতে বলে গেছেন যে, অ্যারিস্টট্লের দর্শন তিনি বার বার পড়েও বুঝতে পারেননি, পরে অল্-ফরাবির লিখিত টীকা-গুলি পড়ে যখন বুঝতে পারলেন তখন আনন্দে দিশাহারা হয়ে তিনি রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন। যাকে সামনে পেলেন তাকেই খুশিমত বহু জিনিস বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

আরবীয়রা চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরি করতে শিখে-ছিলেন। বাগদাদে প্রথমে কাগজ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মযুদ্ধের সময়ে আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইউরোপবাসীর

পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলে ইউরোপবাসী তাঁদের লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন—ইউরোপের ইতিহাসে তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মহম্মদের আবির্ভাবের সময় আরবের অধিবাসীরা কয়ভাগে বিভক্ত ছিল? আরবের অধিবাসী সম্বন্ধে কি জান?

২। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে? তাঁর সম্বন্ধে যা জান বল।

৩। কোরানের বিষয়বস্তু কি?

৪। মহম্মদ কিভাবে তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করেন?

৫। খলিফা কারা? প্রথম কয়েকজন খলিফার পরিচয় দাও। খলিফা পদে দলাদলি দেখা দিলে কি ঘটে?

৬। মহরম কেন পালন করা হয়?

৭। আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৮। স্পেনে আরবীয় সাম্রাজ্য কিভাবে বিস্তৃত হয়েছিল?

৯। পৃথিবীর সভ্যতায় আরবীয়দের অবদান সম্বন্ধে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ইসলামীয় সভ্যতার সূচনা কবে হয়?

২। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

৩। চীনের একটি বংশের নাম কর যে বংশের রাজারা শক্তিশালী ছিলেন।

৪। 'শেখ' কাদের বলা হয়? তারা কয়ভাগে বিভক্ত ছিল এবং কি কি?

৫। বেদুইনদের প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

৬। 'কাবা' শব্দের অর্থ কি?

৭। 'কাবা' কোথায়?

৮। হজরত মহম্মদের পিতা ও মাতার নাম কি ছিল?

৯। হজরত মহম্মদ বাল্যকালে কার নিকট প্রতিপালিত হন?

১০। মহম্মদ কাকে এবং কেন বিবাহ করেন?

১১। মহম্মদ কোথায় ঈশ্বরের কি বাণী শুনতে পান?

১২। মহম্মদ নিজেকে সকলের কাছে কি নামে প্রচার করেন?

১৩। কোরান কি? উহা কিভাবে প্রকাশিত হয়?

১৪। পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের নাম কর।

১৫। মুসলমান কাদের বলা হয়?

১৬। প্রত্যেক মুসলমানের প্রাথমিক কর্তব্য কি কি?

১৭। ইসলামধর্ম মানুষকে কি শিক্ষা দেয়?
১৮। মহম্মদের নতুন ধর্ম প্রথমে কে কে গ্রহণ করে?
১৯। হিজরত কাকে বলে?
২০। কিভাবে মহম্মদ মক্কায় প্রবেশ করেন?
২১। মহম্মদ কবে এবং কি অবস্থায় দেহত্যাগ করেন?
২২। খলিফা কি?
২৩। প্রথম খলিফা কে হন?
২৪। প্রথম চারজন খলিফার নাম কর।
২৫। মুয়াবিয়া কিভাবে খলিফা-পদে নির্বাচিত হন?
২৬। মুসলমানেরা মহরম পালন করেন কেন?
২৭। মহরমের ঘটনা কবে ঘটে?
২৮। কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা কোন্ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন?
২৯। মুয়াবিয়া প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম কি এবং কেন?
৩০। আব্বাসীয় বংশ নাম হয় কেন?
৩১। আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা কে ছিলেন?
৩২। কাদের মূর বলা হয়?
৩৩। অ্যারাবেস্ক কি?
৩৪। ইউরোপের কেন্দ্রভূমিতে ইসলামের প্রচার সম্ভব হয়নি কেন?
৩৫। আরবীয় সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হয়?
৩৬। অল্-মামুন কে? তিনি কি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন?
৩৭। আব্বাসীয় যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম কর।
৩৮। কে প্রথম হাম ও বসন্ত রোগের চিকিৎসার ওষুধ আবিষ্কার করেন?
৩৯। এই যুগে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নাম কর।
৪০। ইবন্-সিন্না কে? তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে কি বলে গেছেন?
৪১। কারা কাদের নিকট থেকে কাগজ তৈরির কৌশল শেখে? কোথায় প্রথম কাগজ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বন্ধনীর মধ্যে যে কথাটি ঠিক তার উপর '√' চিহ্ন দাও :

(ক) ইসলামীয় সভ্যতার সূচনা হয় (খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে)

(খ) কাবা মন্দির ছিল (মদিনায়, মক্কায়, বাগদাদে)

(গ) হজরত মহম্মদের জন্ম হয় (৫৭০ খ্রীস্টাব্দে, ৫৫০ খ্রীস্টাব্দে, ৫১০ খ্রীস্টাব্দে)

(ঘ) মক্কা থেকে মদিনা যাত্রাকে বলা হয় (হিজরত, কোরান, পয়গম্বর)
(ঙ) প্রথম খলিফা ছিলেন (আলি, আবুবকর, ওসমান)
(চ) আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী ছিল (মক্কায়, বাগদাদে, মদিনায়)
(ছ) বীজগণিত আবিষ্কার করেন (আরবীয়রা, ভারতীয়রা, স্পেনীয়রা)

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
(ক) — শব্দের অর্থ চৌকো জিনিস।
(খ) মহম্মদের পিতার নাম ছিল — ও মাতার নাম ছিল —।
(গ) মহম্মদ নিজেকে — — বা — নামে সকলের কাছে প্রচার করতে থাকেন।
(ঘ) — থেকেই মুসলমানী বর্ষ হিসাব করা হয়।
(ঙ) ওমরের পর খলিফা নির্বাচিত হন — এবং ওসমানের পরে —।
(চ) কারবালা প্রান্তরের শোচনীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা — ও — দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন।
(ছ) — ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও দার্শনিক।
(জ) আহম্মদ-অল-বিরুণীর লেখা গ্রন্থের নাম —।
(ঝ) আরবীয়রা — কাছ থেকে কাগজ তৈরি করতে শিখেছিলেন।
(ঞ) — প্রথম কাগজ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। ইসলামীয় সভ্যতার সূচনা কবে এবং কোথায় হয়েছিল ?
২। বেদুইন কারা ?
৩। আরবীয়দের তীর্থক্ষেত্রের নাম কি ?
৪। হজরত মহম্মদ কোথায় এবং কবে জন্মগ্রহণ করেন ?
৫। মহম্মদের পিতা ও মাতার নাম কি ?
৬। আল্লার দূত কাকে বলা হয় ?
৭। কোরান কি ?
৮। হিজরা কাকে বলে ?
৯। মহম্মদের একজন শিষ্যের নাম কর।
১০। খলিফা কাদের বলা হয় ?
১১। ওমর কে ?
১২। ওসমানের পর কে খলিফা হন ?
১৩। হাসান কে ছিলেন ? তাঁকে কিভাবে হত্যা করা হয় ?
১৪। কারবালা প্রান্তরে করুণ কাহিনী কবে ঘটেছিল ?
১৫। 'মূর' কাদের বলা হয় ?
১৬। তারিখ-অল্-হিন্দ্ কার লেখা ?

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে জার্মান জাতির ফ্রাঙ্ক শাখা পশ্চিম ইউরোপে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিপত্তি লাভের সূচনা হয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে। বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানির কতকাংশ জুড়ে প্রথমে ফ্রাঙ্কদের রাজ্য গড়ে ওঠে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রাঙ্ক-নেতা চার্ল্‌স্ মর্টেল পয়তিঁয়ারের যুদ্ধে (৭৩২ খ্রী.) মুসলমানদের পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের ফলে পিরানীজ্ পর্বতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে মুসলমানদের অগ্রগতি প্রতিহত হয়। চার্ল্‌স মর্টেলের পুত্র পিপিন এবং তাঁর পুত্র হলেন শার্লেমেন।

(ক) সম্রাট শার্লেমেন (৭৬০-৮১৪ খ্রী.)

বাগদাদের খলিফা হারুন-অল্ রসিদের সমসাময়িক ছিলেন ফ্রাঙ্ক-সম্রাট শার্লেমেন। মধ্যযুগের ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট শার্লেমেন একটি জার্মান-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ৭৪২ খ্রীস্টাব্দে। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফ্রাঙ্কদের রাজা হন। যৌবনেই তিনি অসামান্য দৈহিক শক্তি ও অতুলনীয় সাহসের অধিকারী হলেন। স্বজাতীয় গৌরবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার তুলনা হয় না। তাঁর কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারে শহুরে জৌলুস ছিল না; কিন্তু তাঁর সরল ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হতেন। জীবনে



সম্রাট শার্লেমেন

তিনি লেখাপড়া কমই করেছেন। বার্ধক্যে তিনি লেখার অভ্যাস শুরু করেছিলেন কিন্তু সেরকম সফল হননি। পড়াশুনার অভ্যাস তাঁর ছিল এবং তিনি বেশ কিছু ভাল ভাল বই পড়েছিলেন। তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা বুঝতেন এবং জার্মান ভাষা ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিত এগিনহার্ডের লেখা থেকে শার্লেমেন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি।

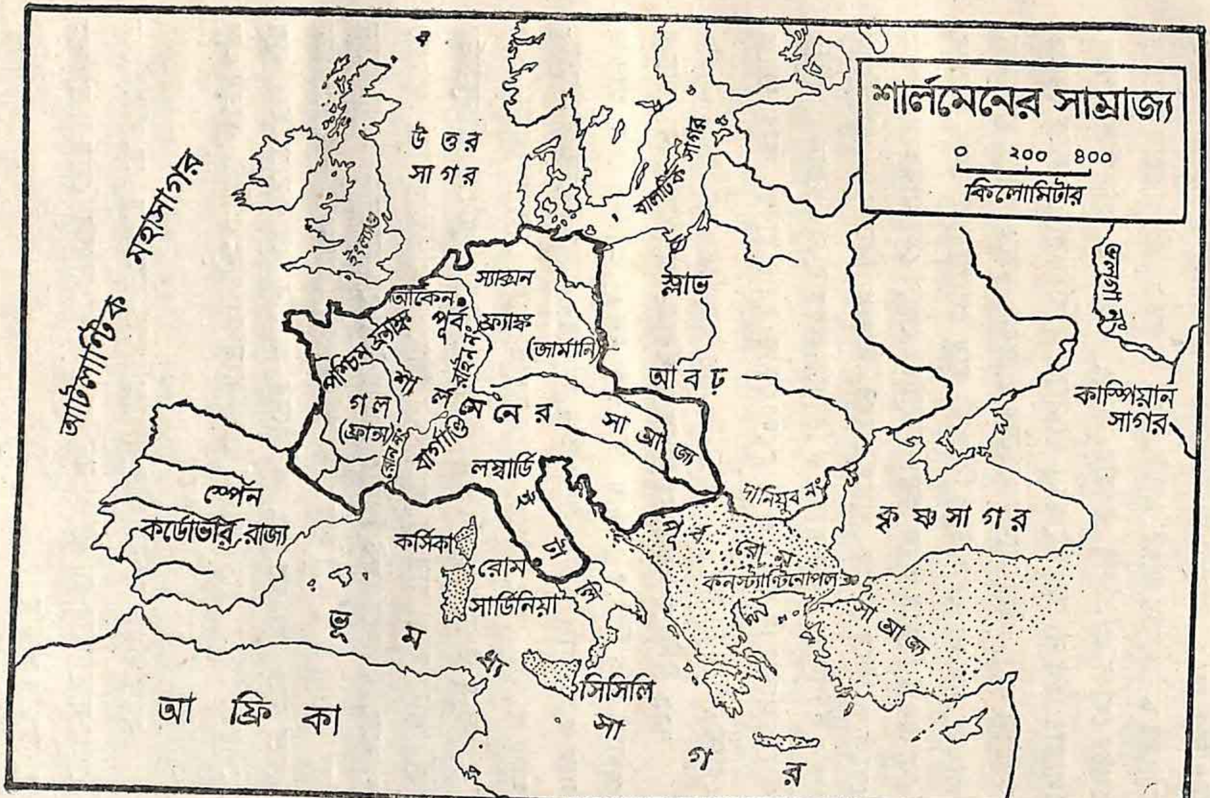
॥ শার্লেমেনের রাজ্যজয় ॥

পূর্বেই বলেছি যে, শার্লেমেন ছিলেন জার্মান ফ্রাঙ্ক জাতির নেতা। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটা ছিল সংঘর্ষের যুগ, অশান্তির যুগ। অন্যান্য জার্মান উপজাতিরা ফ্রাঙ্কদের প্রভুত্ব মানতে চাইবেন না, এটাই ছিল সে আমলে স্বাভাবিক। সামন্ত-প্রথা তখন সমাজে প্রবর্তিত হয়েছে। সামন্ত রাজাদের অধীনে বহু সৈন্য-সামন্ত থাকতো। জার্মান উপজাতি স্যাক্সন এবং লম্বার্ডরা যেমন তাঁর কর্তৃত্ব সহজে স্বীকার করেননি, তেমনি তাঁর আর একটি বড় শত্রু ছিল স্পেন অঞ্চলের আরবীয় মূর-শাসকেরা। তাই সারাজীবন ধরেই রাজা শার্লেমেনকে যুদ্ধবিগ্রহে কাটাতে হয়েছে।

তিনি মূর আক্রমণ থেকে মধ্য ইউরোপকে রক্ষা করেছিলেন। জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ব্যাভেরিয়ানদের রাজ্য তিনি দখল করে নিয়েছিলেন। লম্বার্ডরা ইটালি আক্রমণ করলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। শার্লেমেন লম্বার্ডদের পরাজিত করেন। স্যাক্সনদের সঙ্গেও তাঁকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি স্যাক্সনদের পরাজিত করে তাদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। বিজয়ী শার্লেমেনের শক্তি ও প্রতিপত্তির কথা সমসাময়িক ইউরোপে প্রবাদের মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

॥ রোম-সম্রাট শর্লেমেন ॥

ইউরোপে যখন শার্লেমেনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল তখন ৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তৃতীয় লিয়ো রোমের পোপ


শার্লমেনের সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
কিলোমিটার
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
বালটিক সাগর
ইংলন্ড
স্যাক্সন
আকেন
পূর্ব ফ্র্যাঙ্ক
(জার্মানি)
পশ্চিম ফ্র্যাঙ্ক
রাইন নং
শ্লাভ
আবর
গল
(ফ্রান্স)
রোন নং
বার্গাণ্ডি
শার্লমেনের সাম্রাজ্য
লম্বার্ডি
স্পেন
কর্ডোভার রাজ্য
কর্সিকা
রোম
সার্ডিনিয়া
সিসিলি
দানিয়ুব নং
পূর্ব রোম সাম্রাজ্য
কনস্ট্যান্টিনোপল
কৃষ্ণসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
ভলগা নং
ভূমধ্য সাগর
আফ্রিকা

নির্বাচিত হন। কনস্ট্যান্টিনোপলের পূর্বদেশীয় গ্রীক চার্চগুলোর সঙ্গে রোমের চার্চগুলোর সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। এই অবস্থায় রোমের চার্চের যোগ্য প্রতিনিধি হওয়ার শক্তি, সাহস ও কর্মদক্ষতা পোপ লিয়োর ছিল না বললেই হয়। রোমের নাগরিকরা পোপকে পছন্দ করতেন না। তাঁর অনেক কাজের প্রতিবাদ করতে করতে যখন ফল পাওয়া গেল না তখন তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে পোপকে আক্রমণ করলেন এবং একটি গির্জায় তাঁকে বন্দী করলেন। পোপ কোনোরকমে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে শার্লেমেনের আশ্রয় নিলেন। শার্লেমেন তখন ইটালিতে একটি সামরিক শিবিরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁর দেহরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করে তাঁকে রোমে পৌছে দিলেন।

৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে বড়দিনের সময়ে প্রার্থনার জন্য শার্লেমেন রোমের প্রখ্যাত সেন্ট পিটার গির্জায় উপস্থিত হন। প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোপ তৃতীয় লিয়ো তাঁর মাথায় রোমের সম্রাটদের রাজ-মুকুট পরিয়ে দেন, তাঁকে রোম-সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং 'অগাস্টাস্' উপাধিতে ভূষিত করেন (৮০০ খ্রী.)। পণ্ডিত এগিন্হার্ডের বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে, শার্লেমেন পোপের অভিপ্রায় পূর্বে জানতে পারলে, ঐ সময়ে সেন্ট পিটার গির্জায় উপস্থিত হতেন না। শার্লেমেন তখন নানা যুদ্ধে জয়ী হয়ে বেশ শক্তিশালী ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলা হয় যে, শার্লেমেন প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করে পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোম-সম্রাট নামে কীর্তিত হন।

সমসাময়িক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শার্লেমেন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নন এবং তাঁর আমলে রোম-সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার ঘটেনি।

পোপ তৃতীয় লিয়ো নিজের নিরাপত্তার জন্যই শার্লেমেনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। শার্লেমেন সাময়িকভাবে জার্মান জাতির

উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সামন্ত-প্রথার কল্যাণে প্রত্যেক সামন্তের যথেষ্ট সৈন্যবল ছিল। সুযোগ পেলেই তাঁরা বিদ্রোহী হতেন। রাইন নদীর পশ্চিমাংশে অবস্থিত জার্মানরা ল্যাটিন ভাষার চর্চা করে কিছুটা রোমীয় সভ্যতার প্রভাবে এসেছিল, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের জার্মানরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা সর্বদাই করতো। স্পেন অঞ্চলে মূরদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি শার্লেমেন খর্ব করতে পারেননি, যদিও পূর্ব রোমীয় সম্রাটদের সঙ্গে তিনি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। সমুদ্রের উপকূলে তখন নর্ডিক নর্থম্যানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলণ্ডে তখন নর্ডিক দিনেমারদের প্রভুত্ব। হাঙ্গেরী ও রাশিয়াতে তখন শ্লাভ ও তুর্কীদের প্রভাব। অতএব এইরূপ রাজনৈতিক অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ রোম-সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়।

॥ শার্লেমেনের বিদ্যোৎসাহিতা ॥

জার্মানীর আকেন শহরে শার্লেমেন তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল। খেতে বসলে তাঁকে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা বইগুলি পড়ে শোনানো হতো। শীতকালে তিনি আইলা-স্যাপেল শহরে জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে নানা আলোচনায় রত থাকতেন। দেশ-বিদেশ থেকে তিনি অনেক পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। ইংলণ্ডের ইয়র্ক শহরবাসী পণ্ডিত অল্‌কুইন, ইটালীয় পণ্ডিত পল তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাটের রাজপ্রাসাদেও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপের এক অশান্তিময় পরিবেশে শার্লেমেন শান্তি স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি ইতিহাসে 'গ্রেট' বা 'মহান্' উপাধিতে খ্যাত হয়েছেন।

॥ চার্চ ও সম্রাটদের সম্পর্ক ॥

সেণ্ট পিটারের গির্জায় শার্লেমেনের রাজ্যাভিষেকের ঘটনাবলী ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শার্লেমেনকে পোপ নিজের হাতে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। এটি একটি শুভ ঘটনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে সংঘর্ষের বীজ এ সময়েই রোপিত হলো। শার্লেমেন নিজেও পোপের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুঝেছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে পুত্র লুইকে বারে বারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন হলে পোপের হাত থেকে রাজমুকুট ছিনিয়ে নিয়ে মাথায় পরতে হবে, রাজমুকুট পরাবার সম্মান পোপকে দেওয়া ঠিক হবে না। লুই কিন্তু পিতার নির্দেশ উপেক্ষা করেছিলেন। পোপ ও জার্মান সম্রাটদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ইউরোপের ইতিহাসে নতুন ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) ধর্মযাজকদের গির্জা বা মঠ

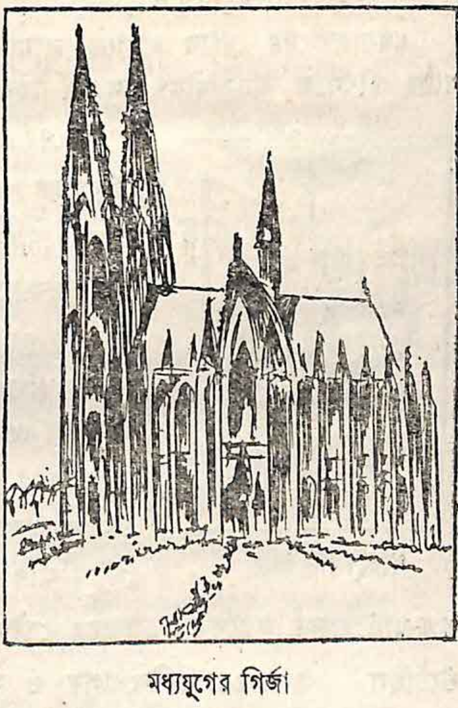
খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমের সম্রাটেরা খ্রীস্টান ধর্মমত গ্রহণ করে এই ধর্মপ্রচারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম যুগের খ্রীস্টানদের পক্ষে প্রচলিত পূজা-অর্চনা সম্পুর্ণ বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। বহুদিনের অভ্যস্ত বিলাস-বহুল জীবনকে সংযত করাও কঠিন ছিল। অন্যদিকে যীশুর সরল সহজ পবিত্র ধর্মমতকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে অনেক সাধু পবিত্র জীবন যাপন করতেন। তাঁরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র ছিলেন, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে গরিষ্ঠ ছিলেন। নানা কৃচ্ছ্রতা সাধন করে তাঁরা মুক্তির পথের সন্ধান করতেন। মুক্তি-লাভের দুটি পথের নির্দেশ তাঁরা দিয়েছিলেন : (ক) গির্জায় অবস্থান করে একান্ত চিত্তে ধর্ম-সাধনা; (খ) সন্ন্যাসী হয়ে নির্জনে পর্বতগুহায় তপস্যা।

॥ মনাস্টারির উৎপত্তি ॥

এই শ্রেণীর সাধুরা প্রথমে বাস করতেন পর্বত-গুহায়, বৃক্ষের ছায়ায় বা ছোট ছোট কুটির বেঁধে। একসঙ্গে বাস, একরকমের

খাদ্য গ্রহণ, একরকমের ধর্মচর্চা করে তাঁরা জীবন-যাপন করতেন। ধীরে ধীরে জীবন-যাত্রার কিছুটা উন্নতি হলো। ঘর-বাড়ি একটু বড় করে গির্জা বা মনাস্টারি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং গির্জার ছোট ছোট কুঠরিতে একান্তমনে ধর্ম-সাধনায় রত থাকতেন।

মধ্যযুগে গির্জা বা মঠগুলি ছিল ধর্ম-শিক্ষা ও ধর্ম-প্রচারের বিশিষ্ট কেন্দ্র। সেণ্ট পল, সেণ্ট পিটার, সেণ্ট অগাস্টাইন, জেরোম প্রমুখ মহাপুরুষেরা যীশুর পবিত্র ধর্ম প্রচার করে এই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁদের আদর্শ জীবন-যাত্রার দৃষ্টান্তে জনসাধারণ উৎসাহিত হতো। তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করে তারা ধর্মজীবনে অনুপ্রাণিত হতো।



মধ্যযুগের গির্জা

খ্রীস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন পোপ। তিনি রোমের সেণ্ট পিটার গির্জায় বাস করতেন। ঐ গির্জাটিই ছিল ইউরোপের খ্রীস্টানদের কেন্দ্রীয় দপ্তরখানা। পোপ প্রথম গ্রেগরীর সময়ে জার্মানরা দলে-দলে খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় গোটা ইউরোপ খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করায় গির্জা বা মঠের প্রয়োজন আরও বেশি দেখা দিল। ধর্মীয় প্রশাসনেও নতুন নতুন আইন-কানুন এবং নতুন পদের সৃষ্টি হতে লাগলো।

॥ যাজকদের শ্রেণী ॥

মঠের সন্ন্যাসী যাজকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ তুই-ই থাকতেন। পুরুষ যাজকদের বলা হতো 'মঙ্ক্' এবং যাজিকাকে বলা হতো 'নান্'। পুরুষের মঠ বা গির্জাকে বলা হত 'মনাস্টারি'; নারীদের মঠকে বলা হতো 'নানারী'; পুরুষ মঠাধ্যক্ষকে বলা হতো 'অ্যাবট্' বা 'প্রায়র'। নারী মঠাধ্যক্ষাকে বলা হতো 'অ্যাবেস্' বা 'প্রায়রেন'। উচ্চপদস্থ যাজকদের পদও ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতে থাকে। প্রত্যেক প্রদেশে 'আর্চবিশপ', জেলায় 'বিশপ', গ্রামে বা প্যারিসে 'প্রীস্ট' বা পুরোহিতের পদ সৃষ্টি হয়।

॥ যাজকদের বিভিন্ন কাজ ॥

ধর্মযাজকদের চেষ্টায় সমাজে নানা উন্নতির সূচনা হয়েছিল। মঠের জীবনকে জনসাধারণ আদর্শ হিসাবে মনে করতেন; তাই যাজকদের প্রত্যেকটি কাজ গণ-জীবনে উৎসাহের সঞ্চার করতো। ধর্মযাজকেরা নিজেরা যেমন নানা বৃত্তি শিখতেন, তেমনি জনসাধারণকেও শেখাতেন। শিক্ষক, লেখক, ছুতোর-মিস্ত্রী, শিল্পী, স্থপতির বিভিন্ন বৃত্তি তাঁরা নিজেরা গ্রহণ করতেন। তাঁরা পতিত জমির উদ্ধার করে চাষের যোগ্য করে তুলতেন; জমিতে জল-সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন, নদীর উপরে সেতু-নির্মাণ ও চলাচলের সুবিধার জন্য পথ-ঘাট প্রস্তুত করতেন। তাঁদের চেষ্টায় অনেক শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বহু দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয় তাঁরা স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা প্রাচীন পুঁথিগুলি নকল করে রাখতেন এবং বহু গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।



পাণ্ডুলিপি রচনা

সাধারণ মানুষকে ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁরা অনেক সময়ে

গল্প বা রূপকথার আশ্রয় নিতেন। প্রয়োজন মত তাদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত করতেন ; আবার তাদের ভাসবেসে, তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করতেন। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই মধ্যযুগের মানুষরা ধীরে ধীরে বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠলো।

ধর্মযাজকেরা সে যুগের মানুষের অন্তর জয় করে ইউরোপকে জয় করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন এক ধর্মযুদ্ধের সৈনিক এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সেবাপরায়ণা একদল ধর্মযাজিকা। তাঁরা মানুষের ক্ষত-বিক্ষত মনকে স্নেহ-ভালবাসায় সুস্থ করে তুলতেন।

ইউরোপীয় সভ্যতাকে এক চরম দুঃসময়ে রক্ষা করেছিল খ্রীস্টধর্ম। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিলো দুর্নীতি। এযুগের মানুষেরা যেন বল-বীর্য হারিয়ে অমানুষে পরিণত হয়েছিল। ধর্মযাজকেরাই এই সংকটের হাত থেকে ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করেছিলেন

॥ বেনিডিক্টের সম্প্রদায় ॥

৫২৯ খ্রীস্টাব্দে ইটালির নেপলস্-এর নিকটবর্তী মণ্টেকেসিনোতে সন্ত বেনিডিক্ট একটি গির্জা বা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। মঠটিকে 'শান্তিনিকেতন' বলা যেতে পারে। এখানে ছুটে আসতো ভূমিহারা কৃষক, হতাশা-পীড়িত মানুষ ও জ্ঞানলাভে ব্যাকুল ছাত্র-সম্প্রদায়। বেনিডিক্টের শিষ্যদের বলা হতো বেনিডিক্ট ধর্ম সম্প্রদায়। আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বেশ কিছুটা মিল রয়েছে।

ইটালির স্পেলিটো শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেনিডিক্টের জন্ম। লেখা-পড়ার জন্য তিনি রোমে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর চরিত্রে নানা দুর্নাম রটনায় ক্ষোভে-দুঃখে তিনি রোম পরিত্যাগ করেন। এ সময় থেকে সন্ন্যাসীদের ন্যায়

কৃচ্ছ্রতা বরণ করে তিনি মুক্তিলাভে যত্নবান হন। সেবাইন পাহাড়ের একটি গুহায় তিনি সাধনা করতে থাকেন। পরে মণ্টেকেসিনোতে মঠটি স্থাপন করেন।

॥ শপথ-গ্রহণ ॥

বেনিডিক্টের সম্প্রদায়ে যোগ দিতে হলে প্রত্যেককে শপথ নিতে হতো: (ক) দারিদ্র্য দুঃখ বরণ করবো, (খ) নিজেকে পবিত্র রাখবো, (গ) কখনও এই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করবো না।

মঠবাসীদের অতিথি-সেবা নিত্যকার কর্তব্য ছিল। কোনো মঠবাসীই দুপুরের পূর্বে খেতে পারতেন না। অতিথিদের আসার সময় লক্ষ্য করেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি মঠবাসীকে ক্ষেত-খামারে, দোকানে, রান্নাঘরে সব রকম কাজ করতে হতো।

ধর্মজীবন পালনের জন্য আরও কিছু নির্দেশ বেনিডিক্ট দিয়েছিলেন, যথা: (ক) প্রতিবেশীকে ভালবাসবে, নিজের মত দেখবে। হিংসার ভাব ত্যাগ করবে। মানবজাতিকে শ্রদ্ধা করবে। আর্ত ও দরিদ্রের সেবা করবে। (খ) উপবাস করে নিজেকে শুদ্ধ করবে। বাক্‌-সংযম অভ্যাস করবে। ভিন্নমত হলেও আলাপ-আলোচনার সাহায্যে সমাধানে পৌঁছতে চেষ্টা করবে। হতাশা বা নৈরাশ্যে ভেঙে পড়বে না।

॥ ক্লুনীর মঠে সংস্কার-আন্দোলন ॥

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বেনিডিক্টের নির্দেশগুলি পালন করে ইউরোপের খ্রীস্টান-সমাজ উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাজকদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। সামন্তদের সঙ্গে রাজশক্তি যুক্ত হয়ে যাজকদের কাজে নানা বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। এই সময় ক্লুনী মঠের সন্ন্যাসীরা খ্রীস্টান ধর্মে নতুন নতুন সংস্কার প্রবর্তন করে যাজক-শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন। এই সন্ন্যাসীরাও বেনিডিক্ট সম্প্রদায়ের অনুগামী

ছিলেন। নীলাস্, রিচার্ড, জারহার্ড, রমুয়ালড্ প্রভৃতি সাধুরা এই আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ফরাসী দেশে বার্গাণ্ডির অন্তর্গত ক্লু্নী নামক স্থানে এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৯১০ খ্রীস্টাব্দে। এই মঠের যাজকেরা যে নতুন আন্দোলনের সূচনা করেন তার প্রভাব—ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, জার্মানি এবং ইটালিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নতুন আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল সামন্ত ও রাজাদের অত্যাচার থেকে যাজকদের রক্ষা করা এবং যাজক শক্তিকে নিয়ম-নীতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা। এর প্রধান প্রধান সংস্কারগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) যাজকদের উচ্চপদে নিয়োগের জন্য গির্জা বা মঠে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই নির্বাচনে রাজা বা সামন্তদের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। (খ) গির্জা বা মঠের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমির মালিক হবেন শুধুমাত্র যাজকেরা। (গ) প্রত্যেক আর্চবিশপ ও বিশপ নিজস্ব পদমর্যাদার নিদর্শনস্বরূপ একটি 'দণ্ড' এবং 'আংটি' ব্যবহার করবেন। তাঁরা এবং তাঁদের অধীনস্থ যাজক কর্মচারীরা কখনও রাজা বা সামন্তদের নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন না।

(গ) যাজকদের অভিষেক ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন দেশে রকমারি উৎসবের মাধ্যমে রাজার অভিষেক হতো এবং রাজ্যের উপরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো। জনপদের উপরে রাজার অধিকার, যাজকেরাও এখানকার অধিবাসী। তাই যাজকদের উপরে রাজার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোনো আপত্তিই চলতো না। কিন্তু যাজকশক্তি, রাজশক্তির সমান্তরালভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাজকদের উচ্চপদে অভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে নানা সমস্যা দেখা দিল।

॥ অধিকার-বিধি ॥

যীশুখ্রীস্ট তাঁর ধর্মমত পালনের জন্য গির্জা বা মঠ প্রতিষ্ঠার কথা বলে গিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ধর্ম পরিচালনার জন্য পোপ, আর্চ-বিশপ্, বিশপ্ প্রভৃতি উচ্চ যাজকপদের সৃষ্টি হয়। যাজকদের অধিকার-বিধি রক্ষা করা ক্লুনী মঠের সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। যাজকদের বিচারের জন্য পৃথক্ আইন এবং পৃথক্ বিচারালয়ের দাবিও জোরদার হয়েছিল।

কিন্তু দেশের রাজা ও সামন্তরা যাজকদের অধিকারগুলি মানতে রাজী হলেন না। যেহেতু ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন রাজা এবং তাঁর অধীনস্থ সামন্তেরা, তাই রাজা ও সামন্তেরা নির্বাচিত যাজকের নিকট থেকে মোটা রকমের দক্ষিণা আদায় করে নিতেন। উচ্চপদ লাভের মোহে অনেক যাজক এই দক্ষিণা দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাই প্রদেশে ও জেলায় রাজাদের খামখেয়ালিতে অনেক সময়ে ধর্মাধ্যক্ষের আসনের বেচা-কেনা চলতো। অনেকদিন থেকেই এই কু-প্রথাটি চলে আসছিল।

॥ পোপ সপ্তম গ্রেগরী ॥

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সপ্তম গ্রেগরী পোপের আসনে অভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন জার্মান। জার্মান ভাষায় তাঁকে 'হিলডেব্রাণ্ড' বলা হয়। এটির বাংলা অর্থ 'একটি পবিত্র অগ্নি-শিখা'। পোপ ও যাজকদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি তীব্রভাবে রুখে দাঁড়ালেন।

জার্মান সম্রাটেরা তখন নিজেদের 'পবিত্র রোম-সম্রাট' নামে অভিহিত করতেন; তাঁরা ঘোষণা করতেন যে, প্রাচীন রোম-সম্রাটদের শক্তি ও খ্যাতির তাঁরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অন্য-দিকে ইটালিতে পোপের কর্তৃত্ব জার্মান সম্রাট এবং উত্তর ইউরোপের রাজা ও সামন্তেরাও পছন্দ করতেন না। একদিকে

সম্রাটদের, অন্যদিকে পোপদের কর্তৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো।

সপ্তম গ্রেগরী ইউরেপের খ্রীস্টানদের উপরে পোপের সম্পুর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইলেন। স্বভাবতঃই তাঁর এ কাজে বাধা দিলেন জার্মান-সম্রাট। গ্রেগরীর মতে আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে পার্থিব শক্তি অত্যন্ত তুচ্ছ। তিনিই সূর্য, তাঁর আলোকেই সম্রাটেরা আলোকিত হতে পারে।

পোপ প্রথমে তাঁর নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য যাজকদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যাজকদের অভিষেকের ব্যাপারে সম্রাট, রাজা ও সামন্তদের কোনো হস্তক্ষেপ করা চলবে না, সমগ্র ইউরোপে তিনি পোপের নেতৃত্বে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন।

॥ পোপ ও সম্রাটদের সংঘর্ষ ॥

যাজকদের অভিষেকের ব্যাপার নিয়ে পোপের সঙ্গে সম্রাটদের সংঘর্ষ দীর্ঘদিন চলেছিল। এই সময়ে সপ্তম গ্রেগরী এবং তৃতীয় ইনোসেণ্টের ন্যায় বিচক্ষণ পোপদের নেতৃত্বের ফলে জার্মান-সম্রাট চতুর্থ হেনরি, পঞ্চম হেনরি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরির ন্যায় ব্যক্তিকেও পোপের প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়েছিল।

(ঘ) *বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়*

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে পণ্ডিতেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন :

(ক) একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। পূর্বদেশীয়

সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমের পরিচয় ঘটায় গ্রীক-আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

(খ) ভূমধ্যসাগরে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি হওয়ায় পশ্চিম দেশের সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের সভ্যতার আদান-প্রদান সহজ হয়।

(গ) পোপ সপ্তম গ্রেগরী লৌকিক শিক্ষায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ; ফলে আইন, চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি পড়ে।

॥ মঠ-বিদ্যালয় ॥

ষষ্ঠ শতাব্দীতে মণ্টেকেসিনোতে বেনিডিক্টের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠে লেখা-পড়ার যে সুযোগ-সুবিধা ছিল তা পরবর্তী সময়ে ক্লুনী মঠ প্রতিষ্ঠার পরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। মঠের কাছাকাছি যারা বাস করতো তারাও মঠে পড়ার সুযোগ পেত। এই সকল মঠ-বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক একসঙ্গে বসবাস করতেন। তাই তাঁদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার মধুর সম্পর্ক অতি সহজেই গড়ে উঠেছিল।

ফ্রান্সিস্কান্ ও ডমিনিকান্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা 'ফ্রায়ার' বা সাধুভাই নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে ধর্মোপদেশ দিতেন এবং ভিক্ষা করে সরল জীবন-যাপন করতেন। পঠন-পাঠনে তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহ দেখাতেন। ফলে জনশিক্ষার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ॥

উচ্চশিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে মঠ-বিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হতে থাকে। ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রেরণা বিশেষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মধ্যযুগের মানুষেরা ভাবতে শিখলো যে, তিনটি বৃহৎ শক্তির দ্বারা পৃথিবীর মানুষেরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ; এই শক্তিগুলো হলো গির্জার যাজক,

রাজা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্প্রদায়। গির্জার বিভিন্ন আইন জানতে, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে, চিকিৎসা ও দর্শন-শাস্ত্র ভালভাবে বুঝতে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রয়োজন দেখা দিল। আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তাই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনও আবদ্ধ থাকেনি। এই নতুন ভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে ইটালির বোলোন, স্যালার্নো, ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ফরাসী দেশের প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

প্রথম দিকে ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র পাঠে উৎসাহ দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিদ্যা,—যথা—চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য পাঠের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।


অধ্যয়ন-অধ্যাপনা

বোলোনে আইনশাস্ত্র, স্যালার্নোতে চিকিৎসাশাস্ত্র, প্যারিস, অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান পাঠের জন্য ইউরোপের নানাস্থান থেকে দলে দলে ছাত্র সমবেত হতে থাকে।

॥ কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ॥

সম্রাট শার্লেমেনের রাজসভায় অনেক পণ্ডিত সমবেত হয়েছিলেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে অলকুইন ও পিটার, ধর্ম-দর্শনে পল্‌, কাব্য-সাহিত্যে থিয়োডুল্‌ফ এবং জীবন-বৃত্তান্ত রচনায় আইনহার্ডের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পোপ চতুর্থ আলেকজাণ্ডার প্যারিস ও অক্সফোর্ডে অধ্যাপক

নিয়োগের ক্ষেত্রে ফ্রায়ারদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। পণ্ডিত গ্রসিটেস্ট, আলেকজাণ্ডার, মহামতি অ্যালবার্টাস, টমাস একুইনিয়াস্ প্রভৃতি ফ্রায়ার-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আইনশাস্ত্রে পণ্ডিত ইর্-নেরিয়াসের জন্য বোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। প্যারিসে অধ্যাপক সাঁম্পোয়ে আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবেলার্ড ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। অ্যাডাম্ মারস্, ওকাম্ ও রজার বেকনের ন্যায় পণ্ডিতদের খ্যাতি সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রথম যুগে 'স্কুলমেন্' নামে পণ্ডিতেরা ধর্মশাস্ত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। গ্রীক্ পণ্ডিত অ্যারিস্টট্লের দর্শনের ব্যাখ্যা তাঁরা নিজেদের মত করতেন। যুক্তিবাদী পণ্ডিতেরা প্রথমে আক্রমণ চালালেন 'স্কুলমেন'দের উপরে। রজার বেকন্ বিজ্ঞান-চর্চার পথিকৃৎ। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ও গণিতের চর্চা তিনিই শুরু করেন। তিনি আরবীয় চক্ষুচিকিৎসা শিখে নিয়ে বহু 'লেন্স' তৈরি করেছিলেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যাকাশে দুটি উজ্জ্বল তারকা ছিলেন ইংলণ্ডের কবি চসার এবং ইটালির মহাকবি দান্তে। চসারের 'ক্যান্টারবেরির কাহিনী' ও দান্তের 'ডিভাইন্ কমেডি' কেবলমাত্র মধ্যযুগের নয়, সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব সৃষ্টি।

মধ্যযুগে বিশুদ্ধ ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে সাধারণ লোকের ভাষা মিশে গিয়ে নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফরাসী, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান ও ইংলিশ প্রভৃতি আধুনিক ভাষার উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

২। শার্লেমেন কিভাবে রোম-সম্রাট হন?

৩। শার্লেমেনের বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে কি জান? শার্লেমেনের সময়ে চার্চ ও সম্রাটদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল?

৪। মনাস্টারির উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান? পোপ কোথায় বাস করতেন?

৫। ধর্মযাজকদের কি কি বিভিন্ন কাজ ছিল? তাঁরা কি প্রকারে ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করেছিলেন?

৬। বেনিডিক্টের সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি জান?

৭। ক্লুনির মঠ কোথায় অবস্থিত ছিল? এখানে 'সংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?

৮। যাজকদের অধিকার-বিধি সম্বন্ধে কি জান?

৯। সপ্তম গ্রেগরী কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে যা জান বল।

১০। মধ্যযুগে কোন্ কোন্ ঘটনা পণ্ডিতদের জ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করেছিল?

১১। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিভাবে গড়ে ওঠে? কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর।

১২। মধ্যযুগের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের নাম করে তাঁদের কৃতিত্ব উল্লেখ কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শার্লেমেন কে ছিলেন?

২। শার্লেমেন কত খ্রীস্টাব্দে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৩। তাঁর প্রকৃতি কেমন ছিল?

৪। শার্লেমেন সম্বন্ধে আমরা কার লেখা থেকে জানতে পারি?

৫। শার্লেমেনের কয়েকটি শত্রু জাতির নাম কর।

৬। শার্লেমেন কাদের পরাজিত করেন?

৭। শার্লেমেনের সময় রোমের পোপ কে ছিলেন?

৮। শার্লেমেন পোপকে কিভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন?

৯। শার্লেমেন কিভাবে রোমের সম্রাট হন?

১০। পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

১১। শার্লেমেন কোথায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন?

১২। শার্লেমেনের জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রবল—ইহা কিভাবে জানা যায়?

১৩। শার্লেমেনকে মহান্ বলা হয় কেন?

১৪। মৃত্যুর পূর্বে শার্লেমেন পুত্রকে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন?

১৫। শার্লেমেনের পুত্রের নাম কি? তিনি কি পিতার নির্দেশ মেনেছিলেন?

১৬। রোমের সম্রাটরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন কবে?

১৭। চতুর্থ শতাব্দীতে সাধুরা কিরূপ জীবন-যাপন করতেন?

১৮। মুক্তিলাভের জন্য তাঁরা কি কি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন?

১৯। সাধুরা প্রথমে কোথায় বাস করতেন?

২০। পরবর্তীকালে তাঁরা কোথায় বাস করতে শুরু করেন?

২১। খ্রীস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুর নাম কি?

২২। তিনি কোথায় বাস করতেন?

২৩। ইউরোপের খ্রীস্টানদের প্রধান কেন্দ্র কোন্‌টি?

২৪। জার্মানরা কার আমলে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে?

২৫। মধ্যযুগের ধর্মশিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র কোন্‌টি ছিল?

২৬। কয়েকজন মহাপুরুষের নাম কর যাঁরা যীশুর পবিত্র ধর্ম প্রচার করেন।

২৭। 'মঙ্ক' ও 'নান' কাদের বলা হতো?

২৮। সাধারণ মানুষকে ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য ধর্মযাজকেরা কি করতেন?

২৯। সে যুগের ধর্মযাজকদের 'ধর্মযুদ্ধের সৈনিক' বলা হয় কেন?

৩০। খ্রীস্টধর্মের অবদান কি?

৩১। কোন্ মঠকে 'শান্তি নিকেতন' বলা হয়?

৩২। বেনিডিক্টের শিষ্যদের কি বলা হত?

৩৩। বেনিডিক্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর প্রথম জীবন কিরূপে অতিবাহিত হয়?

৩৪। বেনিডিক্টের সম্প্রদায়ে যোগ দিতে গেলে কি কি নিতে হতো?

৩৫। ধর্মজীবন পালন করবার জন্য বেনিডিক্ট কি কি নির্দেশ দিয়েছিলেন?

৩৬। ক্লুনীর মঠ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩৭। ক্লুনী মঠের প্রধান সংস্কার আন্দোলনগুলি কি ছিল?

৩৮। হিলডেব্রাণ্ড কে ছিলেন?

৩৯। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে কে পোপ হন?

৪০। জার্মান সম্রাটরা নিজেদের কি ভাবতেন?

৪১। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে?

৪২। এই সময়কার কয়েটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর।

৪৩। সম্রাট শার্লেমেনের সভায় কয়েকজন পণ্ডিতের নাম কর।

৪৪। কয়েকজন ফ্রায়ার সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতের নাম কর।

৪৫। 'স্কুলমেন' কাদের বলা হয়?

৪৬। বিজ্ঞান-চর্চার পথিকৃৎ কে ছিলেন?

৪৭। মধ্যযুগের সাহিত্যে দুইজন উজ্জ্বল তারকার নাম কর।

৪৮। ইউরোপের কয়েকটি আধুনিক ভাষার উৎপত্তি হয় কিভাবে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) শার্লেমেন ইতিহাসে — বা — উপাধিতে খ্যাত হয়েছেন।

(খ) খ্রীস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন —।

(গ) পুরুষ যাজককে বলা হতো —, যাজিকাকে বলা হতো —।

(ঘ) পুরুষদের গির্জা বা মঠকে বলা হতো —, নারীদের মঠকে বলা হতো —।

(ঙ) ফরাসী দেশে — অন্তর্গত — নামক স্থানে মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৯১০ খ্রীস্টাব্দে।

(চ) জার্মান ভাষায় সপ্তম গ্রেগরীকে বলা হয় —।

(ছ) বোলোনে, — স্যালার্নোতে — পড়ানো হতো।

২। যে উত্তরটি ঠিক তার উপর √ চিহ্ন বসাও :—

(ক) শার্লেমেনের সময় খ্রীস্টান ধর্মগুরু ছিলেন। — তৃতীয় ফ্রেডারিক, তৃতীয় লিয়ো, দ্বিতীয় যোশেফ

(খ) শার্লেমেন নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। — কোপেনহেগেনে, রোমে, অ্যাকেন শহরে

(গ)	নারী মঠাধ্যক্ষকে বলা হতো	নান, অ্যাবেস, মঙ্ক
(ঘ)	ফ্রানসিসকান ও ডোমিনিকান সম্প্রদায় সন্ন্যাসীরা পরিচিত ছিলেন।	অ্যাবট নামে, ফ্রায়ার নামে, বেনিডিক্ট নামে
(ঙ)	স্যালার্নো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো।	দর্শন, আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র
(চ)	ক্যান্টরবেরির কাহিনী লিখেছিলেন।	দান্তে, চসার, টমাস অ্যাকুইনাস
(ছ)	মধ্যযুগে বিজ্ঞান-চর্চার পথিকৃৎ ছিলেন	অ্যারিস্টটল, অ্যালবার্টাস, রজার বেকন

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। শার্লেমেন কবে ফ্রাঙ্কদের রাজা হন ?

২। শার্লেমেনের সমসাময়িক এক পণ্ডিতের নাম কর।

৩। শার্লেমেন প্রার্থনার জন্য কত খ্রীস্টাব্দে কোথায় উপস্থিত হন ?

৪। কে কাকে অগাস্টাস উপাধি দান করেন ?

৫। শীতকালে শার্লেমেন কোথায় অবস্থান করতেন ?

৬। শার্লেমেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন এমন কয়েকজন পণ্ডিতের নাম কর।

৭। মনাস্টারি কাকে বলা হয় ?

৮। ইউরোপে খ্রীস্টানদের কেন্দ্রীয় দপ্তরখানা কোন্‌টি ছিল ?

৯। অ্যাবট ও প্রায়র কাদের বলা হতো ?

১০। আর্চবিশপ ও বিশপের পদ কেন সৃষ্টি হয়েছিল ?

১১। বেনিডিক্ট কে ? তিনি কোথায় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ?

১২। বেনিডিক্ট কোথায় সাধনা করেছিলেন ?

১৩। ক্লুনীর সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাধুর নাম কর।

১৪। ক্লুনীর সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ইউরোপের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল ?

১৫। হিল্‌ডেব্রাণ্ড কথাটির বাংলা অর্থ কি ?

১৬। কয়েকজন সম্রাটের নাম কর যাঁরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন ?

১৭। ফ্রায়ার সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন পণ্ডিতের নাম কর।

১৮। কোন্ পণ্ডিতের জন্য বোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছিল ?

১৯। 'ডিভাইন কমেডি' কার লেখা ?

———

(ক) সামন্ত-প্রথা

নবম শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে প্রায় সমগ্র দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে পুনরায় রাজনৈতিক সঙ্কট চলছিল। এবারকার আক্রমণ স্থলপথে নয়, জলপথে। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ভিকিংগ্‌স্‌, নামে জলদস্যুরা দলে দলে ইউরোপের বিশাল উপকূল-প্রদেশের উপর তীব্র আক্রমণ চালাতে লাগলো। ফ্রাঙ্ক সম্রাটদের সীমান্ত বাহিনী এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলো না। পশ্চিম দিক থেকে হাঙ্গেরীর 'ম্যাগিয়ার' সর্দারেরা ইটালির লম্বার্ড অঞ্চল বিধ্বস্ত করতে লাগলো। মুসলমান জলদস্যুদের আক্রমণে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

ইউরোপের অভ্যন্তরেও অরাজকতা দেখা দিতে লাগলো। জার্মনির স্যাক্‌সনরা ইতিমধ্যে সম্রাট শার্লেমেনের দুর্বল বংশধরদের হাত থেকে সম্রাট পদ কেড়ে নিয়েছিল। সম্রাট অটো এবং তাঁর কয়েক-জন বংশধর 'পবিত্র রোম-সম্রাট' উপাধি ধারণ করে বেশ কয়েকবছর ধরে ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু জার্মানদের মধ্যে ঐক্যের অভাব থাকায় প্রথম থেকেই জার্মান সাম্রাজ্যের ভিতটি ছিল খুবই দুর্বল। তাই ইউরোপের অভ্যন্তরে রাজশক্তি দিনদিনই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামাজিক বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়েছিল। এই শোচনীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাতে ইউরোপে সামন্ত-প্রথার উদ্ভব হয়।

সামন্ত-প্রথার উৎপত্তি

সামন্ত-প্রথাকে একটি নতুন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। ইউরোপের অধিবাসীরা এই প্রথাকে গ্রহণ করেছিল একমাত্র জীবনরক্ষার তাগিদে। ভূ-সম্পত্তির ভোগ-

দখলের শর্তে এই প্রথার উৎপত্তি হলেও ধীরে ধীরে ইহা একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।

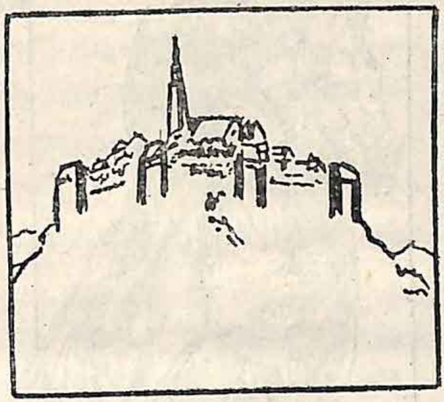
সামন্তরা দেশের রাজার কাছ থেকে সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে ভূ-সম্পত্তি লাভ করতেন। তাঁরা আবার তাঁদের উপসামন্তদের মধ্যে অনুরূপ শর্তে জমি বিলি-বন্দোবস্ত করতেন। উপসামন্তেরা পুনরায় বিভিন্ন শর্তে তাঁদের অধীনস্থ জমিদারদের মধ্যে জমি বণ্টন করতেন। এই প্রকারে রাজা থেকে আরম্ভ করে ছোটখাটো জমিদার পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জমি বন্টিত হতো কতকগুলি শর্তানুসারে। যে-সকল মেহনতী মানুষ গায়ের রক্ত জল করে খেটে-খুটে জমির ফসল ফলাতো জমির শর্ত থেকে তারাই বঞ্চিত হতো। সামন্ত ও তাঁদের অধস্তন মালিকেরা। কখনই সমস্ত জমির বিলি-বন্দোবস্ত করতেন না। বেশ কিছু জমি তাঁরা খাসদখলে রেখে দিতেন। চুক্তি অনুসারে সেখানে চাষ-আবাদ চললেও লাভের মুনাফা ভোগ করতেন জমির মালিকেরা। সামন্তদের অঞ্চলে তাঁরাই ছিলেন প্রভু। একদিকে তাঁরা জমির মালিক, অন্যদিকে সরকারী আইন-কানুন তাঁদের স্বার্থেই কার্যকরী হতো। ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারী ক্ষমতা, ফলে সামন্ত-প্রথাটি অচিরেই একটি স্বৈরতন্ত্রের সামিল হয়ে পড়েছিল।

॥ সামন্তদের দুর্গ ॥

সীমান্ত প্রদেশে এবং ইউরোপের অভ্যন্তরে সম্রাটদের রাজ-প্রতিনিধিরা 'ডিউক', 'কাউন্ট', 'ব্যারন' প্রভৃতি উপাধি নিয়ে এক-প্রকার স্বাধীনভাবে রাজকার্য চালাতেন। বিশপ, অ্যাবট প্রভৃতি ধর্মযাজকেরা এ সময়ে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁরাও সামন্ত-পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সম্রাটেরা এবং দেশের রাজশক্তি সামন্তদের সৈন্য-সহায়তার উপরেই নির্ভর করতেন। তাই বিপন্ন জনসাধারণ নিরাপত্তার জন্যই এই সব সামন্তদের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। বাঁচার তাগিদে বেশির ভাগ লোকই

সৈনিকের কাজের জন্য ছুটে যেতো সামন্তদের কাছে। গোটা ইউরোপ পরিণত হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমর-শিবিরে।

সামন্তদের ঘর-বাড়ি ছিল এক একটি দুর্গের মত। তাঁরা সাধারণত পাহাড়ের উপরে এবং সমতল প্রদেশের উঁচু স্থানে পাথর দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করতেন। বাড়িগুলিকে উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হতো। দুর্গের উচ্চ অংশ থেকে সর্বদাই শত্রুদের গতি-বিধির উপরে লক্ষ্য রাখা হতো। প্রাসাদ-দুর্গে সর্বদাই প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্য মোতায়েন রাখা হতো। সামন্তদের দুর্গের আশেপাশে তাঁদের আশ্রিতদের ঘর-বাড়ি নির্মিত হতো। শত্রুর আক্রমণের সময়ে তারা সহজেই দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারতো।



সামন্তদের প্রাসাদ-দুর্গ

সামন্তরা কেবলমাত্র সামরিক দায়িত্বই পালন করতেন না। তাঁরা বহুবিধ অ-সামরিক কাজ করতেন, তাঁরা শান্তিরক্ষা করতেন, মামলা-মোকদ্দমার বিচার করতেন, আবার চোর-ডাকাতদের আক্রমণ থেকে পথিকদের রক্ষা করতেন। তাঁদের সাহায্যেই দুর্গম পথে বণিকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন।

নাইট সম্প্রদায়

মধ্যযুগে এক ঘোরতর দুর্দিনে 'নাইট' নামে বীর যোদ্ধারা ইউরোপকে রক্ষা করেছিলেন। প্রথম দিকে মুসলমানদের আক্রমণ এবং পরবর্তী সময়ের জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে তাঁরা অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইউরোপের অভ্যন্তরেও

বিপন্ন নর-নরনারীকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁরাই এগিয়ে গিয়েছিলেন।



যুদ্ধের পোশাকে নাইট্

সামন্তদের অলংকার স্বরূপ ছিল 'নাইট্'-সম্প্রদায়। তাঁরা লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণে নিজেদের সুরক্ষিত করে ঢাল-তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতেন। মল্লযুদ্ধে, শিকারে, আবার বাজপাখির মত শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁরা ছিলেন তুলনাহীন। সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা, নরনারীর সম্মানের জন্য জীবনপণ এবং ধর্মের জন্য যে কোন বিপদকে তুচ্ছ-জ্ঞান করা নাইট্‌রা ধর্ম মনে করতেন।

॥ নাইট্ উপাধি ॥

সাধারণত সামন্তদের ছোট ছেলেরাই 'নাইট্' হতো। এই ছেলেটিকে সাত-আট বছর বয়স থেকে একজন সামন্তের কাছে শিক্ষার জন্য পাঠাতে হতো। শিক্ষা শেষ হতো একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। 'নাইট্' হবার পূর্বে গির্জার ধর্মযাজকের কাছে তার পাপের কথা অকপটে স্বীকার করতে হতো। ধর্মযাজক তাকে নানাবিধ ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সামরিক কর্তব্য পালনের উপদেশ দিতেন। এই উপদেশসমূহ পালন করার শপথ তাকে নিতে হতো। তারপর কাঁধে একখানি তলোয়ার নিয়ে

বেদীর কাছে উপস্থিত হলে পুরোহিত ঐ অস্ত্রটি মন্ত্রপূত করে তার কাঁধে রেখে দিতেন এবং 'নাইট' উপাধি প্রার্থনা করার পরে ঈশ্বরের নামে তাকে 'নাইট্' উপাধিতে ভূষিত করা হতো।

॥ নাইটের শপথ ॥

নাইটের আদর্শ ছিল সত্যরক্ষা, বীর, বিনয়ী হওয়া। নারী ও দুর্বলকে রক্ষা, আর্ত-দরিদ্রের সেবা, প্রভুর প্রতি বিশস্ততা, নিজের প্রয়োজনকে তুচ্ছজ্ঞান করে অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখা এবং সর্বোপরি ধর্মরক্ষার জন্য জীবন-পণ যুদ্ধ—এ সব ছিল নাইটের অঙ্গীকার বা শপথ। নাইট্‌দের ন্যায়-নীতি ও বিনয়ী ব্যবহারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপীয়দের আচার-আচরণে যথেষ্ট মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

নাইটেরা জাতীয় ভাষায় কথা বলতেন, জোর কদমে ঘোড়ায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে নিজের ভাষায় গান গাইতেন। জাতীয় ভাষার অনুশীলনে তাঁরাই ছিলেন পথিকৃৎ।

ত্রুবেদর সম্প্রদায়

আমাদের দেশের রাজপুতানার চারণ কবিদের মত মধ্যযুগের ফরাসী দেশে 'ত্রুবেদর' ও জার্মানীতে 'মিনেসিংগার' নামে একদল চারণ কবির আবির্ভাব হয়েছিল। অনেক রাজা মহারাজাও 'ত্রুবেদর' বা 'মিনেসিংগার' হতেন। সামন্ত শাসিত সমাজে চারণ-কবিরা যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন। পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে রচিত গান গেয়ে চারণেরা নতুন যোদ্ধাদের উৎসাহিত করতেন। বীরপূজার যুগ ছিল মধ্যযুগ। রাজা আর্থারের ল্যান্সেলেট্, শার্লেমেনের রোলাণ্ড এবং রবিনহুড্ প্রভৃতির বীরত্ব কাহিনী খুব জনপ্রিয় ছিল। প্রেম-ভালবাসার কাহিনীও চারণদের গানে স্থান পেতো। বিশপ প্রভৃতি ধর্মযাজকেরা যখন প্রাচুর্য ও বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তখন চারণেরা নানা ব্যঙ্গ-সঙ্গীত রচনা করে তাঁদের ধর্মের মুখোশ জনসাধারণের সামনে খুলে

দিয়েছিলেন। সামন্তদের প্রাসাদ-দুর্গে অবসর সময়ে চারণদের সঙ্গীতের আসর বসতো। ধনী মহিলারাও তাঁদের গান শোনাতে আমন্ত্রণ করতেন। ফরাসী দেশের শিল্পরসিক নরনারীরা 'ক্রবেদর'দের বড়ই ভালবাসতেন। 'ক্রবেদর' ও 'মিনেসিংগার'দের গান জাতীয় ভাষায় রচিত হওয়ায় এই ভাষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(খ) সামন্তদের 'ম্যানর'

সামন্তদের ক্ষেতখামার থাকতো পল্লী অঞ্চলে, এখানকার কৃষি সম্পদ্‌ই তাঁদের শ্রীবৃদ্ধির বনিয়াদ রচনা করেছিল। তাঁরা নিজেদের সুবিধা অনুসারে পল্লীগ্রামের চাষবাসের ব্যবস্থা করতেন। সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত গ্রাম বা পল্লীকে 'ম্যানর' বলা হতো।

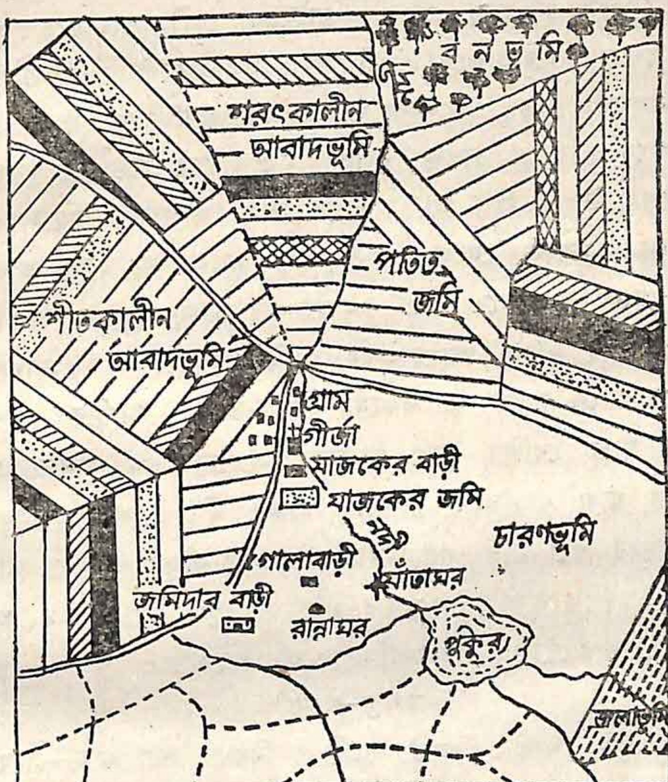
ম্যানর-প্রথা

সামন্তদের অর্থনীতি ছিল ম্যানর-নির্ভর; তাই তাঁদের আর্থিক ব্যবস্থাকে ম্যানর-প্রথা বলা হয়। তখনকার প্রয়োজনীয় সব জিনিস ম্যানরে উৎপন্ন হতো। নানাবিধ খাদ্যশস্য, দুধ, ডিম, মাছ-মাংস, মধু এবং কিছু পানীয় পেলেই সে যুগের অধিবাসীরা সন্তুষ্ট থাকতেন। অন্যান্য ভোগ্য জিনিসপত্র খাদ্যের বিনিময়েই পাওয়া যেত। ছোটখাটো শিল্প ম্যানরেই প্রস্তুত করা হতো। তাই কৃষি ও প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের দিক দিয়ে ম্যানরগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। লোহা, লবণ প্রভৃতি জিনিস সংগ্রহ করতে হতো।

সামন্তদের জমি কৃষকেরা চাষ করে শস্য ফলাতো। তাঁদের অনুগ্রহলাভ করে ছোট ছোট শিল্পীরা তাঁদের কাছ থেকে কাঁচামাল নিয়ে যে সকল জিনিসপত্র তৈরি করতো তাতেই দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটে যেতো।

॥ ম্যানর কোর্ট ॥

ম্যানরকে কেন্দ্র করেই ম্যানরের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। নিজেদের এলাকায় সামন্তেরা ছিলেন ছোটখাটো রাজা। তাঁরাই শান্তিরক্ষক ও বিচারক। তাঁদের বিচার-সভাকে 'ম্যানর-কোর্ট'



ম্যানর পরিকল্পনা

বলা হতো। নিয়মিত কর না দেওয়া বা চুক্তিবদ্ধ কাজ না করাই অপরাধ বলে গণ্য হতো এবং অপরাধীদের শাস্তি ম্যানর-কোর্টেই হতো।

॥ ম্যানর হাউস ॥

ম্যানরে বাস করতেন সামন্ত, তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুচরেরা। পাশে থাকতো কৃষক ও ভূমিদাস সম্প্রদায়। সামন্তদের একাধিক

ম্যানর থাকতো এবং এক ম্যানরের খাদ্যশস্য ফুরিয়ে গেলে তাঁরা চলে যেতেন অন্য ম্যানরে।

ম্যানরের শ্রেষ্ঠ স্থানে নির্মিত হতো সামন্তদের প্রাসাদ বা 'ম্যানর হাউস্'। এটি ছিল একটি দুর্গবিশেষ। পুরু পাঁচিল দিয়ে প্রাসাদ-দুর্গটি সুরক্ষিত করা হতো। বাইরের চাষী প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য থাকতো একটি সেতু। সেটাকে ইচ্ছামত উঠানো বা নামানো যেত। প্রাসাদে থাকতো কয়েকখানা শোবার ঘর এবং মাঝখানে থাকতো প্রশস্ত হলঘর। প্রাসাদের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের উপায় ছিল না, অভ্যন্তর ভাগ থাকতো অন্ধকার ও থমথমে। মশাল জ্বেলে প্রাসাদ-দুর্গ আলোকিত করা হতো। ঘরের দেওয়ালে থাকতো নানারকম নকশার কাজ, দরজায় থাকতো মোটা ভারি পর্দা। আসবাবপত্র বেশি থাকতো না। ম্যানরের হলঘরে মাঝে মাঝে বড় রকমের ভোজ-উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। খাদ্যের মধ্যে বেশির ভাগ থাকতো মাছ-মাংস ও পানীয় এবং সব্জির মধ্যে বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, গাজর, বীট ও শসা। অবসর বিনোদনের জন্য নানা রকম নাচ-গান, হাস্যকৌতুক ও কুস্তি কসরৎ চলতো। শিকার ছিল সামন্তদের সবচেয়ে প্রিয়। নানারকম অস্ত্র-চালনা ও তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো।

সামন্ত-শ্রেণী

সামন্ত-সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—সামন্ত, যাজক এবং কৃষক ও ভূমিদাস। সামন্তদের মধ্যে বড় সামন্ত ও ছোট সামন্ত এবং যাজকদের মধ্যে বিশপ, অ্যাবট্ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর যাজক এবং পুরোহিত প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর যাজক—এই ভাগগুলি করা হতো। এই তিনটি শ্রেণীকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করলেই ভাল হয়। একটি হলো শাসক-শ্রেণী, আর একটি শাসিত-শ্রেণী। শাসক-শ্রেণীকে হুজুর বা শোষক আর মজুর-শ্রেণীকে শাসিত বা শোষিত-শ্রেণী বললেই ঠিক হয়। জমির মালিক হতেন

শাসক-শ্রেণী। তাঁদের সংখ্যা কম হলেও তাঁরাই প্রভুত্ব করতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের উপর।

বড় সামন্ত যখন ছোট সামন্তকে জমি দান করতেন, তখন ছোট সামন্তের কাছ থেকে পেতেন আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার। বড় মালিকের কর্তব্য ছিল ছোট মালিককে রক্ষা, তাঁর প্রতি সুবিচার এবং আইনের সাহায্য ব্যতীত তাঁকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। ছোট সামন্তেরা প্রভুর আপদ-বিপদে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন এবং তিনি শত্রুর হাতে বন্দী হলে তাঁকে টাকা দিয়ে উদ্ধার করা হতো। তা ছাড়া বড় সামন্তের ছেলেদের 'নাইট্' হওয়ার সময়ে এবং মেয়েদের বিয়ের সময়ে একটা মোটা রকমের কর দিতে বাধ্য থাকতেন। এ-ছাড়া আরো নানারকমের সেলামী দিতে হতো। সামন্ত-সমাজে এই পরস্পর দেওয়া-নেওয়া সম্পর্ক ছিল আইনসিদ্ধ।

পোপ সপ্তম গ্রেগরীর আমল থেকে নানা সংস্কারের ফলে প্রত্যেকটি গির্জার দখলে অনেক ভূ-সম্পত্তি এসেছিল। যাজকেরাও সামন্তদের ন্যায় বিলাস-বহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরাও পদাধিকার বলে জমি ভোগ করতেন এবং নিম্নশ্রেণীর যাজকদের উপরে প্রভুত্ব করতেন। কৃষকদের উপরে অত্যাচারে যাজকেরাও সামন্তদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে পড়তেন না।

॥ মালিক-চাষীর সম্পর্ক ॥

বর্তমানে আমরা বলি, 'লাঙ্গল যার, জমি তার'—চাষ করে যে, জমির মালিক সে। মধ্যযুগে বলা হতো, প্রভু ছাড়া জমি নেই, জমি ছাড়া প্রভু নেই। অর্থ-সঙ্গতির দিক দিয়ে মালিক ও চাষীর মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। মালিকের অনুগ্রহে চাষী যে জমিটুকু পেতো, তার পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু করের বোঝা কম ছিল না। প্রভুর জমিতে চাষীকে চাষ করতে হতো সামান্য মজুরীতে। তাঁদের খাস জমিতে বেগার খাটতে হতো। জমির

উৎপন্ন ফসল প্রায় সবটাই যেতো মালিকের গোলাঘরে। নিজেদের রক্ত জল করে চাষীরা ফসল ফলাতো। তাদের পরিশ্রমেই মালিকদের খাওয়া-পরা, বিলাস-ব্যসনের সব সামগ্রী জুটতো।

॥ ভূমিদাস শ্রেণী ॥

সামন্ত-সমাজের সর্বনিম্নে ছিল ভূমিদাস শ্রেণী। তাদের 'সাফ' ও 'ভিলেন' বলা হতো। স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ঋণের দায়ে বহু কৃষক ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। মালিকদের কাছ থেকে নানারকম চুক্তিতে ভূমিদাসেরা ফালি ফালি জমির বন্দোবস্ত নিত। ঐ নির্দিষ্ট জমি ছেড়ে তাদের অন্য কোথায়ও যাওয়ার উপায় থাকতো না। জমির মালিক বদল হলে তাদের মালিকও বদল হতো। ভূমিদাস সহ সবটুকু জমি মালিকেরা বিক্রি করতে পারতেন, কিনতেও পারতেন। মালিকের কাছে ভূমিদাসদের নানা কাজের প্রতিশ্রুতি দিতে হতো। প্রতিশ্রুতি মত কাজ না করলে এবং মালিকের পাওনা মেটাতে না পারলে মালিক শুধু জমি থেকে নয়, ম্যানর থেকেও ভূমিদাসদের বিতাড়িত করতে পারতেন। এর জন্যে মালিকদের কোন কৈফিয়ৎ দিতে হতো না।

॥ মালিকের প্রাপ্য ॥

ভূমিদাসদের মালিককে নানা কর দিতে হতো। মালিকের খাস জমিতে সপ্তাহে কমপক্ষে দুদিন বেগার খাটতে হতো। এটা ছিল বাধ্যতামূলক। তাঁর অনুমতি ব্যতীত ম্যানরের বাইরে ভূমিদাসেরা তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে পারতো না; কারণ ভবিষ্যতে ভূমিদাস হারাবার কোন ঝুঁকি মালিকেরা নিতে চাইতেন না। কোন ভূমিদাসের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীকে মালিককে একটা অতিরিক্ত কর দিতে হতো শুধুমাত্র চাষের অধিকার পাওয়ার জন্য।

ভূমিদাসদের বাধ্যবাধকতার অন্ত ছিল না। মনিবের কলে তাদের গম ভাঙাতে হতো। তাঁদের মাড়াই-কলে আঙুর মাড়াই

করে মদ তৈরি করা হতো। নগদ পয়সা দিয়ে মালিকের উনুনে রুটি সেঁকতে হতো। মালিকের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে মোটা রকমের জরিমানা দিতে হতো। এদিক-ওদিকে ছড়ানো জমিতে তাদের ঘুরে ঘুরে চাষ করতে হতো।

॥ ভূমিদাসদের জীবনযাত্রা ॥

ম্যানরের মধ্যে খড়ের চালের ছোট ছোট কাঠের বাড়িতে ভূমি-দাসেরা বাস করতো। আগুন লাগলে সব পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। তাদের ঘরে বড়জোর দুটো কোঠা থাকতো। কোন জানালা থাকতো না। বৃষ্টির জল পড়ে ঘরের মাটির মেজে সর্বদাই স্যাঁতসেঁতে থাকতো। ঘরে আসবাবপত্র কিছুই থাকতো না।

তাদের খাদ্য ছিল আটার তৈরি মোটা-মোটা লাল রুটি, পচাই মদ, শাক-সব্জি ও ডিম। ভাল মাংস তাদের জন্যে কমই জুটতো। সাদা রুটি ও মুরগীর মাংস খাওয়া তাদের নিষিদ্ধ ছিল। চামড়ার পোশাক তাদের পরতে হতো। তাদের সম্পত্তির মধ্যে থাকতো কয়েকটা শূয়োর, গরু, বলদ, আর থাকতো একটা ঘোড়া। মনিবদের চোখে তারা গরু-বলদের চেয়ে উঁচুশ্রেণীর জীব ছিল না।

ভূমিদাসদের পরিবারে মেয়েদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো। গৃহস্থালীর হাড়ভাঙা খাটুনী, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা, সুতো কাটা, কাপড় বোনা—এসব কাজ তো ছিলই, তার সাথে ছিল চাষের কাজে স্বামীকে সাহায্য করা।

ভূমিদাসেরা ছিল নিরক্ষর। সন্ধ্যার পরে তাদের পড়ে পড়ে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করার থাকতো না। আমোদ-প্রমোদের বালাই তাদের ছিল না। তবে মাঝে মাঝে এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের কুস্তি, লাঠিখেলার প্রতিযোগিতা হতো। এই সময়ে কিছু নাচগান ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকতো।

॥ ভূমিদাসদের মুক্তির উপায় ॥

ম্যানর থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া ভূমিদাসদের মুক্তির আর কোন পথ ছিল না। ধরা পড়লে জুটতো নির্মম শাস্তি। প্রভুদের অত্যাচার যখন সহ্যের বাইরে যেতো তখন তারা পালাতে বাধ্য হতো। ইতিমধ্যে ইউরোপের নানাস্থানে শহর গড়ে উঠেছিল। সেখানে পালিয়ে যেতে পারলে তারা মুক্তির আনন্দ লাভ করতো। সেখানে কল-কারখানায় অতি সহজেই শ্রমিক মজুরের কাজ জুটতো। নিয়ম ছিল এই—এক নাগাড়ে নব্বই দিন শহরে থাকতে পারলে তারা স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করতো। সেখানে বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের পড়াতে পারতো, পছন্দমত তাদের বিয়ে দিতে পারতো। সেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারও তারা লাভ করতে পারতো। শহরগুলি ছিল ভূমিদাসদের কাছে স্বর্গরাজ্য।

পালাবার আর একটা উপায় ছিল। যাজকদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েও তারা যোগ দিতে পারতো। ইংলণ্ডের লোলার্ড নামে এক ধর্ম সম্প্রদায় গরীব চাষীদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে শহরে যখন ধনী বণিকদের নিয়ে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলো তখন থেকে মজুর-শ্রেণী পুনরায় অবহেলিত শোষিত-শ্রেণীতে পরিণত হলো।

॥ কৃষক বিদ্রোহ ॥

সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজা ও সামন্তদের বিরুদ্ধে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্বকালে। যুগসঞ্চিত এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহই প্রথম। এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ : সামন্তেরা কৃষকদের অতিরিক্ত মজুরির দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পার্লামেন্ট সামন্তদের পক্ষ সমর্থন করেছিল এবং শতবর্ষ যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য নতুন মাথট কর দিতে কৃষকেরা অস্বীকার করেছিল। এর পূর্বে ইংল্যাণ্ডে একটা মহামারীতে অতিরিক্ত লোকক্ষয়ের জন্য শ্রমিক সমস্যাও দেখা

দিয়েছিল। ওয়াট টাইলর নামে এক ব্যক্তি কেণ্ট ও এসেক্স অঞ্চলে বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের লোলার্ড সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ কৃষকদের বিদ্রোহ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ অতি সহজে দমন করা হয়। কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থারও কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে মালিকেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র অত্যাচার করে শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা চলবে না।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। সামন্ত-প্রথা বলতে কি বোঝ? সামন্ত-প্রথার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল?

২। নাইট কাদের বলা হত? নাইটদের ধর্ম কি ছিল?

৩। ম্যানর কাকে বলে? ম্যানর হাউস কোথায় গড়ে উঠেছিল?

৪। ভূমিদাস-শ্রেণী বলতে কি বোঝ? ভূমিদাসদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান?

৫। কৃষক-বিদ্রোহের সম্বন্ধে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ম্যাগিয়ার কাদের বলা হয়? তারা কি করতো?

২। ইউরোপের অভ্যন্তরে সম্রাটদের রাজ-প্রতিনিধিরা কি কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?

৩। সামন্তদের ঘর-বাড়ি দেখতে কেমন ছিল? ঐগুলি কোথায় তৈরি হতো?

৪। নাইট্‌ কাদের বলা হয়? তাঁদের কাজ কি ছিল?

৫। নাইট্‌দের ধর্ম কি ছিল?

৬। নাইট্‌ উপাধি কিভাবে দেওয়া হতো?

৭। নাইট্‌দের কি শপথ নিতে হতো?

৮। ক্রবেদর কাদের বলা হয়? তাদের কাজ কি ছিল?

৯। 'ম্যানর প্রথা' কাকে বলে?

১০। ম্যানর কোর্ট কাকে বলে?

১১। ম্যানর হাউস কি?

১২। সামন্ত-সমাজ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত থাকতো ও কি কি?

১৩। বড় সামন্ত ও ছোট সামন্ত বলতে কি বোঝ?

১৪। মধ্যযুগে মালিক-চাষীর সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

১৫। সার্ফ ও ভিলেন কাদের বলা হতো ?
১৬। ভূমিদাস-শ্রেণীর কাজ কি ছিল ?
১৭। ভূমিদাসদের মালিকদের নিকট কি কি বাধ্যবাধকতা ছিল ?
১৮। ভূমিদাসরা কিরূপ বাড়িতে বাস করতো ?
১৯। ভূমিদাসদের খাদ্য সম্বন্ধে কি জান ?
২০। ভূমিদাসদের মেয়েদের কিরূপ পরিশ্রম করতে হতো ?
২১। ভূমিদাসদের মুক্তির কি উপায় ছিল ?
২২। কৃষকেরা কাদের বিরুদ্ধে এবং কবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ?
২৩। কৃষক-বিদ্রোহের কারণ কি ছিল ?
২৪। কৃষক-বিদ্রোহে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ
ক) ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের জলদস্যুদের বলা হত —।
(খ) হাঙ্গেরীর সর্দারদের বলা হত —।
(গ) মধ্যযুগে — নামে বীর যোদ্ধারা ইউরোপকে রক্ষা করেছিলেন।
(ঘ) মধ্যযুগে ফরাসীদের চারণ কবির নাম ছিল —।
(ঙ) জার্মানীর চারণ কবির নাম —।
(চ) সামন্তদের প্রাসাদকে বলা হোত —।
(ছ) কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল ইংলণ্ডের রাজা —— রাজত্বকালে।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। ভিকিংগস্ কারা ?
২। সামন্তদের ঘর-বাড়ি দেখতে কেমন ছিল ?
৩। ইউরোপের নর-নারীকে উদ্ধার করতে কারা এগিয়ে এসেছিলেন ?
৪। নাইট্‌রা কিরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করতেন ?
৫। মধ্যযুগে কাদের বীরত্ব-কাহিনী খুব জনপ্রিয় ছিল ?
৬। ম্যানর কাকে বলা হোত ?
৭। ম্যানরে কারা বাস করতেন ?
৮। ম্যানর হাউস কোথায় তৈরি হতো ?
৯। বড় সামন্ত ও ছোট সামন্ত কাদের বলা হতো ?
১০। ভূমিদাসদের কি কি বাধ্যবাধকতা ছিল ?
১১। ভূমিদাসের সম্পত্তির মধ্যে কি কি প্রধান ছিল ?
১২। ভূমিদাসেরা কিভাবে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করত ?
১৩। লোলার্ড কারা ?
১৪। কৃষক-বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল ?

ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যালেস্টাইন মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। যীশুখ্রীস্টের লীলাভূমি প্যালেস্টাইনে খ্রীস্টানদের অনেক তীর্থ অবস্থিত ছিল। খ্রীস্টানদের তীর্থযাত্রায় আরবীয় মুসলমান শাসকেরা বিশেষ কোন বাধা সৃষ্টি করতেন না। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেলজুক তুর্কী মুসলমানেরা প্যালেস্টাইন অধিকার করে খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের উপরে অত্যাচার শুরু করলো। ইউরোপে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে, পবিত্র তীর্থ জেরুজালেমের গির্জার পবিত্রতা বিধর্মীরা নষ্ট করেছে এবং সেখানকার ধর্মযাজকেরা ভয়ংকরভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এই সংবাদে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ইউরোপের বিভিন্ন রাজশক্তি পোপের নেতৃত্বে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য সামরিক অভিযান পাঠাতে আরম্ভ করে।

ইউরোপের খ্রীস্টানেরা মুসলমানদের অধিকার থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য যে সংগ্রাম করেছিল, ইউরোপের ইতিহাসে তা 'ক্রুসেড্' বা ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর ধরে এই সংগ্রাম চলেছিল।

বহুদিন ধরে মুসলমানদের সঙ্গে ইউরোপীয় রাজশক্তির নানা সংঘর্ষ চলছিল। দুই পক্ষই বিক্ষুব্ধ ছিল। জেরুজালেমের ঘটনাটি যেন বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মত উত্তেজনার শেষ ইন্ধন যোগাল।

ধর্মযুদ্ধের কারণ

ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা। এ যুগে ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ ছিল না।

ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা একমাত্র পুরোহিতেরাই করতেন ; তাঁদের নির্দেশে চলাই ছিল সে যুগের ধর্ম। তীর্থযাত্রা ছিল ধর্মের বিশেষ অঙ্গ এবং তীর্থস্থানে বিধর্মীরা প্রবেশ করলেই তীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হয়—এই বিশ্বাসের পিছনে ধর্মের গোঁড়ামি ছাড়া আর কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

ধর্মযুদ্ধের পিছনে আরও অনেক কারণ ছিল।

তুর্কী মুসলমানেরা বরাবরই ছিল যুদ্ধবাজ। রোমের পোপেরাও পূর্বের মত সহনশীল ছিলেন না। ক্ষমতার নেশায় তাঁরাও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। ইউরোপের রাজশক্তিকে তাঁরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রায়ই ব্যবহার করতেন। অতএব তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাজশক্তি ও সামন্তশক্তিকে উত্তেজিত করাতে পোপ দ্বিতীয় আরবানের উৎসাহের অভাব ছিল না।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত ইটালীর ভেনিস, পিসা, জেনোয়া, মিলান প্রভৃতি নগরসমূহ ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে খুবই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সকল নগর-রাষ্ট্রের নৌবাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী। ভূমধ্যসাগরে মুসলমান নৌশক্তি ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হাঙ্গেরীর অধিবাসীরা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করায় এখান থেকে স্থলপথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা সহজ হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সিয়া ও সুন্নী—এই দুই সম্প্রদায়ে মুসলমানেরা বিভক্ত হয়ে পড়ায় স্বভাবতই ইসলামের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভায় তিন তিনজন স্বাধীন খলিফা রাজত্ব করার ফলে ইসলামের রাজশক্তি আরও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয় খ্রীস্টানেরা ইসলামের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছিল।

পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল মুসলমানদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্বাঞ্চলের গ্রীক চার্চ ও

পশ্চিমাঞ্চলের রোম-চার্চের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল খ্রীস্টানরা তা ভুলে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোটা খ্রীস্টান জগৎ একই সমর-শিবিরে মিলিত হলো।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন পোপ দ্বিতীয় আরবান। এটাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়—একথা তিনি মনে করেছিলেন। যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল গোটা ইউরোপে।

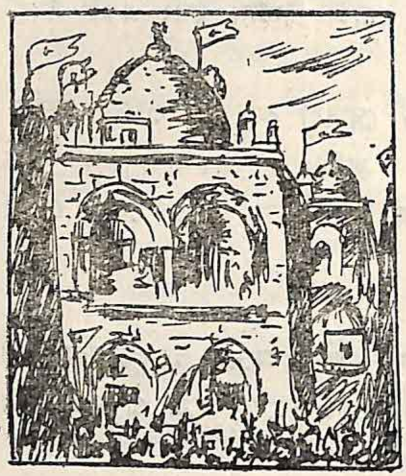
॥ কয়েকটি বিখ্যাত ঘটনা ॥

দুশো বছর ধরে দুই পক্ষের মধ্যে অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। মোটামুটি আটটি বড় রকমের যুদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধর্মযুদ্ধই ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

তখনও ঠিক ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়নি, কিন্তু পিটার নামে একজন খ্রীস্টান সন্ন্যাসী একদল চাষীকে ধর্মযুদ্ধে উত্তেজিত করেন। হৈ হৈ করতে করতে হাজার হাজার চাষী পথে লুটপাট করতে করতে কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছাল। সেখানেও তারা বেপরোয়া লুটপাট করতে থাকে। তখন বাইজাণ্টাইন সম্রাট তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। এই চাষী-ধর্মযোদ্ধারা প্রায় সকলেই তুর্কীদের হাতে নিহত হয়। সন্ন্যাসী পিটার ও তাঁর অল্প কয়েকজন অনুচরমাত্র কোনরকমে প্রাণে বাঁচেন।

তৃতীয় ক্রুসেড্ (১১৮৭)-এর সময় দুই পক্ষেই কয়েকজন বীর যোদ্ধা অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মুসলমানদের পক্ষে ছিলেন তুর্কী সুলতান সালাদিন (সালাউদ্দীন) এবং খ্রীস্টানদের পক্ষে ছিলেন জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস্। সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক প্রথমে ধর্মযুদ্ধে যাত্রা করেন। তাঁর উদ্যম দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, পথে তাঁকে নানা বিপদে পড়তে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি

জলে ডুবে মারা যান। রিচার্ড ও ফিলিপ তুজনেই ছিলেন যুবক, কিন্তু তাঁদের তুজনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। ফিলিপ অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেলে রিচার্ড একাই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি 'সিংহহৃদয়' রিচার্ড নামে বিখ্যাত ছিলেন। বীর সালাদিন ছিলেন এক অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। একবার যুদ্ধে হেরে রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জন্য সালাদিন চিকিৎসক, বরফ এবং নানারকম ফল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।


ধর্মযোদ্ধাদের জেরুজালেম অধিকার

১২০১ খ্রীস্টাব্দে পোপ ৩য় ইনোসেন্ট পুনরায় ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু যোদ্ধারা এসময় থেকে লুঠতরাজের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছিল। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যে চরম অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের ধনসম্পত্তি লুঠ করতে ভেনিসের স্বার্থান্ধ বণিক সম্প্রদায় প্রায়ই সামরিক অভিযান পাঠাতে শুরু করলো। তুর্কীরাও পেছিয়ে পড়লো না। তুর্কীদের আক্রমণেই কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন হয়। ধর্মযুদ্ধও এক সময়ে শেষ হলো।

ধর্মযুদ্ধের ফল

যুদ্ধকে উপলক্ষ করে প্রায় তুশো বছর ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার তুটি বৃহৎ শক্তি পরস্পর মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিল—ভাববিনিময় সহজ হয়েছিল এবং পরিণতিতে তুই দেশের জনসাধারণই উপকৃত হয়েছিল। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের জনজীবনে বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

॥ সমাজ ও অর্থনীতি ॥

ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় সমাজ ও অর্থনীতি নতুন পথে চলতে লাগলো। পোপ ও ধর্মযাজকদের ক্ষমতা এ সময় থেকে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধর্মযুদ্ধে যাত্রার পূর্বে অনেক সামন্ত নিজেদের ধন-সম্পত্তি চার্চকে দান করে যেত। বেশির ভাগ লোকই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে পারেনি। যারা ফিরে এলো তারা দেহ-মনে ছিল সম্পূর্ণ অসহায়। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট যা কিছু থাকতো তাও চার্চের কাছে সমর্পণ করে সেখানকার আশ্রয়-শিবিরে শেষ দিনগুলো কাটাতো। ফলে চার্চের ধন-সম্পদ আরও বাড়তে লাগলো। পরবর্তী-কালে চার্চের বিরুদ্ধে ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের সূচনা হয় এই সময়ের নানা ঘটনা থেকে। রাজাদের ক্ষমতাও এ সময় থেকে ভয়ঙ্করভাবে বাড়তে থাকে। যুদ্ধে নিহত সামন্তদের সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হতো। যুদ্ধের সময়ে অনেক সামন্ত রাজকোষে নিয়মিত কর দিতে পারতো না। এই কারণেও রাজা তাদের সম্পত্তির মালিক হতেন।

সাধারণ মানুষও সামন্ত-প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করলো। ভূমিদাসেরা 'ম্যানর' ছেড়ে শহরের দিকে কাজের সন্ধানে যাত্রা করলো। ছোট ছোট কুটিরশিল্প এ সময় থেকে গড়ে উঠতে থাকে। কৃষির পরিবর্তে শিল্প তৈরির দিকে মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধি পেলো। ফলে সামাজিক অবস্থা ও অর্থনীতির নতুন পরিবর্তন দেখা দিল।

॥ শহরের ঐশ্বর্য ॥

মধ্যযুগের শহরগুলির ঐশ্বর্য এ সময় থেকে খুবই বাড়তে থাকে। ব্যবসায়ীদের আস্তানা ছিল শহরগুলিতে। কাঁচা টাকা তাদের হাতে। ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার সময়ে অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের প্রয়োজন মেটাতেন শহরের বণিক সম্প্রদায়। পরিবর্তে তাঁরাও রাজা ও সামন্তদের কাছ থেকে অনেক সুযোগ-

সুবিধা আদায় করে নিতেন। এই সময়ে অনেক সমৃদ্ধিশালী শহর রাজাদের সনদের জোরে বেশ কিছু স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। বর্তমানের পৌরসভার ন্যায় অনেক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি এ সময় থেকেই শুরু হয়।

ইটালির শহর-বন্দরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে পড়লো। ভেনিস, পিসা, জেনোয়া প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্রগুলির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। পূর্ব সমুদ্রে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে।

॥ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ॥

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা উন্নতি সূচিত হয়। পূর্ব সমুদ্রে যাতায়াতের ফলে ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। সমুদ্রে চলার মত নানা যন্ত্রের আবিষ্কার হতে থাকে। আরবীয়দের কাছ থেকে ইউরোপের লোকেরা নতুন ধরনের বিজ্ঞান, বিশেষ করে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখতে পায়। সামরিক বিজ্ঞানেও বেশ পরিবর্তন এসেছিল। মুসলমানদের নতুন ধরনের দুর্গ নির্মাণ, নতুন ধরনের সামরিক অভিযান ইউরোপের লোকেরা লক্ষ্য করেছিলেন। গির্জা নির্মাণেও পূর্বদেশীয় স্থাপত্যের প্রভাব এ সময় থেকে বৃদ্ধি পায়। পূর্বদেশীয় অনেক জনপ্রবাদ, জনপ্রিয় কাহিনী এ সময়ে ইউরোপীয় সাহিত্যে স্থান পেতে থাকে।

॥ খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ ॥

পূর্ব দেশের মশলা দিয়ে রকমারী রান্না খাবারের স্বাদ ইউরোপের লোকেরা এ সময় থেকেই পেতে লাগলো। পূর্বাঞ্চলের নানা রকমের ফলও তারা খেতে শিখলো। পীচ ফল তাদের এত ভালো লেগেছিল যে, সামন্তরা ফিরে এসে অনেকেই পীচ ফলের চাষ শুরু করেছিল। মুসলমানদের মতো লম্বা ঢিলেঢালা সূতী ও সিল্কের পোশাকের চাহিদা ইউরোপের বাজারে বেড়ে গেল।

পূর্বদেশের খোলা আকাশের নীচে রোদে ঝলমল্ দিনগুলিতে খোলা বাতাসে বেড়াবার স্মৃতি তাদের মনটিকে অভিভূত করেছিল। ইউরোপে নতুন ধরনের ঘরবাড়ি ও গির্জা নির্মাণ ধর্মযুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়েছিল।

॥ ভৌগোলিক আবিষ্কারে প্রেরণা ॥

পরবর্তী যুগে ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রেরণা এ সময় থেকে আসতে থাকে।

ভেনিসের মার্কোপোলো জলপথে এশিয়া অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঐ পথের সন্ধানেই কলম্বাস, ভাস্কো-দা-গামা প্রভৃতি দুঃসাহসিক নাবিকেরা পরবর্তীকালে বেরিয়ে পড়েন এবং নতুন নতুন জলপথ আবিষ্কার করেন। আন্তর্জাতিক ভাবধারা এইভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ক্রুসেডের কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক মিলনের সেতু গড়ে ওঠে। তাই ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রুসেড্ কাকে বলে? ক্রুসেডের কারণগুলি বর্ণনা কর।
২। তৃতীয় ক্রুসেড্ সম্বন্ধে কি জান বল।
৩। মধ্যযুগে ধর্মযুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?
৪। মধ্যযুগে শহরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কি জান?
৫। মধ্যযুগে সমাজ ও অর্থনীতিতে কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ক্রুসেড্ কাকে বলে?
২। কত বছর ধরে ইউরোপে ক্রুসেড্ চলেছিল?
৩। ক্রুসেডের প্রধান কারণ কি ছিল?
৪। মুসলমানেরা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল?
৫। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথম ধর্মযুদ্ধ কে ঘোষণা করেন?
৬। কোন্ কোন্ ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ?
৭। তৃতীয় ক্রুসেড্ কবে শুরু হয়?
৮। তৃতীয় ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বীর যোদ্ধার নাম কর।

৯। ধর্মযুদ্ধে সম্রাট ফ্রেডারিকের পরিণতি কি হয়েছিল ?
১০। রির্চার্ড কি নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং কেন ?
১১। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন হয় কিভাবে ?
১২। ইটালীর কয়েকটি শহর-বন্দরের নাম কর।
১৩। মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হয় ?
১৪। পীচ ফলের চাষ কেমন করে শুরু হয় ?
১৫। কয়েকজন ভৌগোলিক আবিষ্কারকের নাম কর।
১৬। ক্রুসেড্‌কে মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন বলা যায় ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ
(ক) প্রায় — বছর ধরে ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ চলেছিল।
(খ) ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ইটালীর —, ——, —।
(গ) মুসলমানেরা — — এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিল।
(ঘ) পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল —।
(ঙ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন পোপ —।
২। যে উত্তরটি ঠিক তার ওপর '√' চিহ্ন দাও :—
i) ক্রুসেড্ কথাটির অর্থ—সামন্ত, ধর্মযুদ্ধ, ম্যানর।
ii) মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম—ক্রুসেড্, সুন্নী, শাহ্।
iii) তৃতীয় ক্রুসেড্ হয়েছিল—১১৮৭ সালে, ১২০১ সালে, ১২৫১ সালে।
iv) ১২০১ সালে পোপ ছিলেন—তৃতীয় লিও, পঞ্চম গ্রেগরী, তৃতীয় ইনোসেণ্ট।
v) ইটালীর এক শহর-বন্দরের নাম ছিল—তাম্রলিপ্ত, ভেনিস, শিকাগো।
vi) একজন ভৌগোলিক আবিষ্কারক ছিলেন—গ্রেগরী, শার্লেমেন, কলম্বাস।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। প্যালেস্টাইন কবে মুসলমানদের অধিকাভুক্ত হয় ?
২। তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাজশক্তিকে কে উত্তেজিত করেন ?
৩। তিনজন খলিফা রাজত্ব করত এমন তিনটি স্থানের নাম কর।
৪। তৃতীয় ক্রুসেডে মুসলমান পক্ষে কে ছিলেন ?
৫। তৃতীয় ক্রুসেডে কোন্ জার্মান সম্রাট অংশগ্রহণ করেন ?
৬। রিচার্ড অসুস্থ হওয়ায় সালাদিন তাঁর জন্য কি ব্যবস্থা করেন ?
৭। আরবীয়দের কাছ থেকে ইউরোপের লোকেরা কি শিখেছিল ?
৮। ইউরোপে নতুন ধরনের ঘরবাড়ি তৈরি কবে থেকে শুরু হয়েছিল ?

মধ্যযুগে শহরের অভ্যুদয়

প্রাচীন যুগে মিশর, বেবিলোনিয়া, এসিরিয়া, গ্রীস, ভারত ও রোমের অনেক শহর বড় বড় শহর-বন্দরের কথা জানতে পারি। ফিনিসীয় বণিকদের ইতিহাসে সিডন, টায়ার প্রভৃতি বড় বড় সমৃদ্ধিশালী শহরের কথাও জানা যায়। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথমদিকে ইউরোপে প্রকৃত শহর বলতে সে রকম কিছুই ছিল না। প্রাচীন শহরগুলির বেশির ভাগ হূন ও বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণে প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর এলাকার জমিতে চাষ-আবাদ শুরু হয়েছিল। কোন কোন অঞ্চলে সামন্তদের কিছু কিছু প্রাসাদ-দুর্গও তৈরি হয়েছিল।

শহরের উৎপত্তি

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে কিছু কিছু বড় শহরের উৎপত্তি হতে থাকে। রাস্তার পাশে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে উঠলো। সাগর-নদীর উপকূলে বড় বড় বন্দর স্থাপিত হলো।

সব শহরের উৎপত্তির ইতিহাস এক নয়। তবে শহরগুলি প্রতিষ্ঠার পরে দেখা গেল প্রায় সবগুলির একরকমের চেহারা; মনে হয় তারা যেন একই পরিবারভুক্ত। প্রত্যেকটি শহরে থাকতো চার্চ, গুদাম-ঘর, গদি-ঘর, সভা-সমিতির জন্য হলঘর, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাজানো-গুছানো বাড়ি। কোন কোন শহরে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো। সামন্তদের পাঁচিলঘেরা দুর্গের মধ্যে শহরের প্রথম পত্তন হলেও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের ঐশ্বর্য বাড়তে থাকে।

॥ শহর গড়তে ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা ॥

ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-পূর্বের সভ্যদেশগুলির সাথে পশ্চিম ইউরোপের যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হয়। এ সব অঞ্চলের

লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ, নতুন নতুন খাদ্য, তাদের বিলাস-সামগ্রী, ঘর-বাড়ি সব কিছু দেখেই ইউরোপের নাইট্ ও অন্যান্য যোদ্ধারা আকৃষ্ট হয়। পূর্ব মুলুকের অনেক জিনিসের চাহিদা তখন থেকে পশ্চিম দেশে বৃদ্ধি পায়। প্রথম প্রথম ফেরিওয়ালারা পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু জিনিস পশ্চিমের বাজারে বিক্রি করতো; কিন্তু তাতে বেশি লাভ হতো না। তাই বেশি চাহিদার কিছু কিছু জিনিস ছোট ছোট কারখানায় উৎপন্ন হতে থাকে। শিল্প-উৎপাদনের সঙ্গে শিল্পের বাজারও বাড়তে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফেরিওয়ালারা ভোগ্য পণ্যের বিনিময়ে পেতো দুধ, ডিম, মধু, মাছ-মাংস ইত্যাদি। কিন্তু এখন বাজার বড় হওয়ায় মুদ্রার বিনিময়ে কেনা-বেচা চলতে লাগলো।

ধর্মযোদ্ধাদের সব সময়েই টাকার দরকার হতে লাগলো। ভেনিস থেকে জাহাজে উঠতে গেলে ভাড়ার টাকার প্রয়োজন। হোটেলের বিল মেটাতে নগদ টাকার দরকার। শহরের বণিকরা নগদ টাকা ছাড়া মাল দিতে রাজী নন। ফলে সামন্তেরা বণিকদের কাছে জমি বন্ধক দিতে লাগলেন। ইহুদীদের কাছ থেকে চড়া সুদে তাঁরা টাকা ধার করতে লাগলেন। যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে তাঁরা বণিকদের কাছে দলিল করে সম্পত্তি বন্ধক দিতেন; ফিরে এসে দেখতেন জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে।

॥ শহরে স্বায়ত্ত শাসন ॥

ধর্মযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখা যায় (ক) সামন্তেরা দিন দিন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে আর শহরের বণিকরা ধনী হচ্ছে। (খ) পূর্বের দলিলের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরে অর্থের জন্য আরও সুবিধাজনক শর্তে বণিকদের সনদ দিতে সামন্তেরা বাধ্য হলেন। (গ) ভূমিদাসেরা ক্ষেত-খামার ছেড়ে বেশি মুনাফায় বণিকদের কারখানার কাজে ভর্তি হতে লাগলো।

বণিকদের তাগাদায় অস্থির সামন্তেরা সুযোগ পেলেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে বণিকদের ঘর-বাড়ি আক্রমণ করতেন। অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বণিকেরাও সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগলেন। ব্যবসায়ী সংগঠনের উৎপত্তি এইভাবেই শুরু হয়।

প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পীরা ক্ষুদ্র সংগঠন গড়ে তোলে, যথা—তাঁতী-সমিতি, কুটিরশিল্প-সমিতি, কাঠের মিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রি-সমিতি, রুটিওয়ালা-সমিতি। পরে বড় বড় বণিকদের নিয়ে বণিক-সমিতি গড়ে উঠতে লাগলো।

শহর-শাসনের ভার ব্যবসায়ীদের পৌরসভা গ্রহণ করলো। এই পৌরসভার মধ্যে থেকেই মেয়র, অল্ডারম্যান, কমিশনার ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত হতো। ঘিঞ্জি, নোংরা, সরু সরু আঁকা-বাঁকা অন্ধকার গলি ছিল শহরের সাধারণ চেহারা। জল সরবরাহের কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। পৌরসভা এ কাজগুলি গ্রহণ ক'রে শহরের নানা-রকমের উন্নতি সাধন করতে লাগলো। ব্যবসায়ী সঙ্ঘগুলিও জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কাজকর্মের নিয়ম, হাজিরা ও ছুটির সময় প্রভৃতি ঠিক করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে লাগলো।

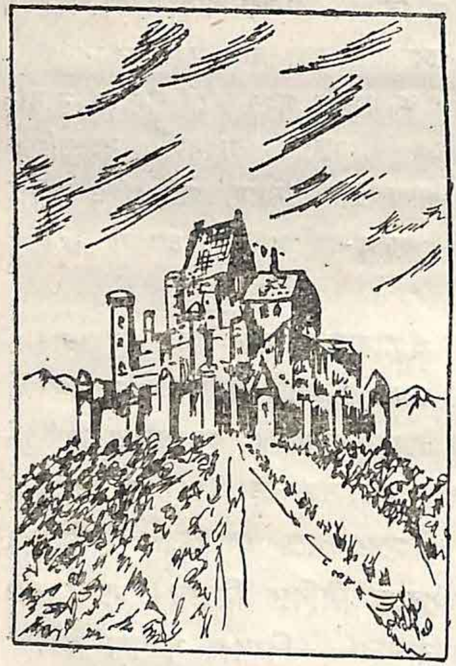
দেশের রাজার কাছ থেকে ও সামন্তদের কাছ থেকে নিত্য-নতুন স্বায়ত্ত-শাসনের সনদ ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ বের করতে লাগলো। সামন্তদের ঠাট বজায় রাখতে সব সময়েই টাকার দরকার। বড় ছেলের 'নাইট্' হওয়ার সময়ে, মেয়েদের বিয়ের সময়ে, বড় বড় উৎসব ও ভোজের সময়ে টাকা কর্জ নিতে হতো বণিকদের কাছে এবং তাঁরাও নিজেদের সুযোগ-সুবিধার শর্তগুলি সনদে লিখিয়ে নিতেন। সামন্তদের অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে রাজারাও বণিকদের সাহায্য করতে থাকেন নানাবিধ রাজকীয় সনদ দিয়ে। ফলে এক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে শহরগুলি গড়ে উঠতে থাকে।

বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বড় বড় শহরের বণিক-সমিতি

একত্র হয়ে 'লীগ' বা সঙ্ঘ গঠন করতো। এই সম্মিলিত বণিক-সঙ্ঘ সামরিক বাহিনী গড়ে তুললো। এইভাবে উত্তর ইটালিতে লম্বার্ড লীগ, বল্‌টিক অঞ্চলে হ্যান্‌সিয়াটিক লীগ প্রভৃতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

॥ শহরের জীবনযাত্রা ॥

ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, মিলান, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলি ভূমধ্যসাগরে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ পেয়েছিল। এই শহরগুলির অধিকাংশ ছিল স্বায়ত্তশাসিত। ফরাসী দেশে প্রোভেন্স, শাঁপানে প্রভৃতি শহর বিখ্যাত হয়েছিল। জার্মানির মিউনিক, নুরেমবার্গ, ইংলণ্ডের লণ্ডন, ইয়র্ক, চেস্‌টার, লিঙ্কন, গ্লস্টার এবং পরবর্তী সময়ে অক্সফোর্ড, ক্যাম্‌ব্রিজ প্রভৃতি শহরের নামও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য।



মধ্যযুগের শহর

প্রবাদ ছিল, শহরের বাতাসে মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়। সামন্তদের আমলে বাঁধাধরা নিয়মের প্রতিবাদ স্বরূপ শহরগুলির উৎপত্তি হয়েছিল।

সর্বপ্রকার স্বাধীনতা শহরে ভোগ করা যেতো। ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুবিধামত ব্যবসা করতো। পথচারীদের চলা-ফেরার কোন বাধা ছিল না। পূর্বে নর নারীদের বিবাহ ব্যাপারেও সামন্তদের অনুমতি নিতে হতো।

শহরে এ ব্যাপারে কোন বাধা ছিল না। সম্পত্তির উত্তরাধিকারেও কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। ভূমিদাসরাও এখানে স্বাধীনভাবে বসবাসের সুবিধালাভ করেছিল।

শহরগুলিতেই আধুনিক অর্থনীতির উৎপত্তি হয়। ম্যানরের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, শিল্প-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। সম্পদের হাতিয়ার হলো ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বণিকেরা সম্পন্ন শ্রেণীতে উন্নীত হতে লাগলেন। সামন্তদের পরিবর্তে রাজারা এই নতুন মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে থাকেন। মধ্যবিত্তের টাকায় রাজারা জাতীয় বাহিনী গড়ে তুললেন। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগঠনে বণিকদের যথেষ্ট অবদান ছিল। শহরগুলিকে কেন্দ্র করেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে। এসময় থেকেই সমাজে নতুন ধরনের শ্রেণীবিন্যাস শুরু হয়।

বুর্জোয়া সম্প্রদায়

শিল্পীদের বাসস্থানের জন্য সামন্তেরা যে স্থানটি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখতেন সে স্থানটিকে বলা হতো 'বার্গ' আর সেখানকার অধিবাসীকে বলা হতো 'বার্গার' বা 'বার্জেনসিস্' বা 'বুর্জোয়া'। বার্গগুলিতে বণিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। তাঁদের চেষ্টায় ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। পুরবাসী মধ্যবিত্ত নাগরিকদেরই বুর্জোয়া বলা হতো। ফরাসীদেশে ধনী বণিকদের দ্বারা গঠিত শহরগুলিকে বলা হতো 'বুর্জোয়া ভিলা'; এবং ছোট ছোট শহরগুলিকে বলা হতো 'কমিউন্'।

বুর্জোয়ারা ছিলেন টাকার মালিক। নিজেদের বিলাস-ব্যসনে যেমন অর্থ ব্যয় করতেন, তেমনি শহরকে সাজাবার জন্য তাঁরা অর্থ খরচ করতেন। তাঁদের চেষ্টাতেই পৌরসভাগুলির উন্নতি হয়েছিল, তাঁরাই ছিলেন শিল্প-স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। এইভাবে সামন্ত-নির্ভর অভিজাত সভ্যতার পরিবর্তে বণিক-নির্ভর ধনতন্ত্রের সূচনা করলেন বুর্জোয়া সম্প্রদায়।

অর্থের সুষম বণ্টন না থাকায় বুর্জোয়াদের হাতে প্রচুর অর্থ জমতে লাগলো। এই শ্রেণী-ই বণিক, ব্যাঙ্কার, শিল্প মালিকদের নিয়ে গঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ফরাসীদেশে এই শ্রেণীকে বলা হতো 'তৃতীয় এস্টেট্'। আর্থিক শ্রেণীবিভাগে প্রথম স্তর অধিকার করলো বুর্জোয়া শ্রেণী; দক্ষ ও অদক্ষ কারিগর নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী এবং নিম্নতম শ্রেণীতে পড়লো প্রোলেটেরিয়েট্ বা সর্বহারার দল। শোষক ও শোষিতের ব্যবধান ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের সূচনা এই সময় থেকেই শুরু হয়।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে শহরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান?

২। মধ্যযুগে শহরের স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে কি জান?

৩। মধ্যযুগে শহরগুলির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান লেখ।

৪। মধ্যযুগে বুর্জোয়া সম্প্রদায় কিভাবে গড়ে ওঠে? তাদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। প্রাচীন যুগের কয়েকটি শহর-বন্দরের নাম কর।

২। দ্বাদশ শতাব্দীতে কিভাবে শহরের উৎপত্তি হয়?

৩। শহর-নির্মাণে ধর্মযুদ্ধ কতটা প্রেরণা জুগিয়েছিল?

৪। ধর্মযুদ্ধের টাকা-পয়সার দরকার হ'লে কি করতেন?

৫। ধর্মযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল কি কি ছিল?

৬। শহর শাসনের ভার কার হাতে ছিল?

৭। লীগ বা সঙ্ঘ কিভাবে গড়ে ওঠে?

৮। ইটালি, জার্মানী ও ফরাসীদেশের কয়েকটি বিখ্যাত শহরের নাম কর।

৯। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগঠনে বণিকদের কি অবদান ছিল?

১০। বুর্জোয়া কাদের বলা হয়?

১১। কমিউন বলতে কি বোঝ ?

১২। শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের সূচনা কিভাবে এবং কখন শুরু হয় ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) প্রাচীনযুগে একটি বড় শহর-বন্দর ছিল — ।

(খ) বড় বড় বণিকদের নিয়ে গড়ে ওঠে — ।

(গ) বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বড় বড় শহরের বণিক-সমিতি একত্র হয়ে — গঠন করত।

(ঘ) জার্মানীর একটি বিখ্যাত শররের নাম — ।

(ঙ) পুরবাসী মধ্যবিত্ত নাগরিকদের — বলা হতো।

(চ) ছোট ছোট শহরগুলিকে বলা হতো — ।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। ফিনিসিয় বণিকদের ইতিহাসে জানা যায় এমন কতকগুলি সমৃদ্ধিশালী শহরের নাম কর।

২। দ্বাদশ শতাব্দীতে কোথায় বড় বড় শহর স্থাপিত হয়েছিল ?

৩। বণিক-সঙ্ঘ কাকে বলে ?

৪। কোন্ স্থানটিকে বার্গ বলা হতো ?

৫। 'বুর্জোয়া ভিলা' কি ?

৬। তৃতীয় এস্টেট্ কি ?

৭। সর্বহারা দলে কারা ছিল ?

॥ ১০ ॥

মধ্যযুগে দূর-প্রাচ্য ঃ চীন ও জাপান

চীন, জাপান এবং তাদের নিকটস্থ দ্বীপসমষ্টি নিয়ে গঠিত এক বিশাল ভূ-ভাগকে 'দূর-প্রাচ্য' বলা হয়। জলপথে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যদেশে আগমনের প্রথম যুগে সেখানকার নাবিকদের আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ঘোরাপথে আসতে হতো। চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে যেতে আরও ঘুরতে হতো। তাই দূরত্বের জন্য তারা এই বিশাল অঞ্চলকে 'দূর-প্রাচ্য' বলতো। কিন্তু এই অঞ্চলসমূহ ভারতের নিকট-প্রতিবেশী; ভারতবাসীর কাছে কিছুতেই 'দূর-প্রাচ্য' নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এইসব দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচার হয়েছিল।

(ক) চীনে তাঙ্ যুগ

তাঙ্ বংশীয় সম্রাটরা প্রায় তিনশো বছর (৬১৮-৯০৬ খ্রী.) ধরে চীন সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। চীনের উত্তর-পশ্চিমে হোয়াঙ্-হো ও উ-য়ে উপত্যকায় তাঙ্‌দের রাজধানী চাঙ্-আন্ অবস্থিত ছিল। চীনা লেখকেরা এই নগরটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নগর হিসাবে বর্ণনা করেছেন, প্রায় দুই লক্ষ নরনারী সুখে-শান্তিতে এখানে বসবাস করতো।

এই বংশের সম্রাট তাই-সুঙ্ ছিলেন উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। উত্তরে আলতাই পর্বতমালা, দক্ষিণে উত্তর ভিয়েত্‌নামের আন্নাম, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং পূর্বে চীন সমুদ্র পর্যন্ত এক বিশাল অঞ্চলে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই সম্রাটের রাজত্বকালে ইউরোপীয় খ্রীস্টান এবং আরবীয় মুসলমানদের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের জন্য প্রার্থনা-মন্দির নির্মাণের

অনুমতি দিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ফলে ভারতীয়দের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ পূর্বেই ঘটেছিল।

এই বংশের সম্রাট সুয়ান-সুঙ্ বা মিঙ্-হুয়াঙ্ (৭১২-৭৫৬ খ্রী.)-এর আমলে তাঙ্ সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটেছিল। বহু কবি,



সাহিত্যিক ও চিত্রকর সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক আরবীয় খলিফা ও ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লেমেনের সমকক্ষ ছিলেন সম্রাট মিঙ্-হুয়াঙ্।

॥ ঐক্যবদ্ধ চীন ॥

তাঙ্‌ যুগে সমগ্র চীন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই সময়ে দক্ষিণ চীনের ইয়াঙ্‌-সি উপত্যকার উর্বর প্রদেশে জন-সমাগম বৃদ্ধি পেয়েছিল। চীনের শাসন-সংস্কার ও আইন-কানুন রচনায় অতীতের প্রভাব সর্বদাই স্বীকৃত হতো। তবে দক্ষিণাঞ্চলে বসতিবিস্তারের ফলে পরিবেশজনিত কিছু কিছু পরিবর্তন যে চীনাদের জীবনে এসেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

চীনের অধিবাসীরা মনে করতো, আকাশে যেমন দুই সূর্যের উদয় অসম্ভব, চীনেও তেমনি দুজন সম্রাটের একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। সম্রাটের নির্দেশে পরিচালিত হতো গোটা শাসন-যন্ত্র। চীনের আমলা-কর্মচারীরা খুব প্রভাবশালী ছিলেন।

শাসন-সুবিধার জন্য গোটা চীন আঠারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি বিভক্ত হতো জেলায়, জেলাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর এলাকায় এবং সর্বশেষে থাকতো গ্রাম। কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রয়োজন মত অর্থ সরবরাহ করতে পারলেই কর্মচারীরা যোগ্য প্রতিপন্ন হতেন। গ্রামের শাসনের ভার থাকতো স্থানীয় প্রবীণদের উপরে।

চীনের লোকেরা বলতো, আকাশ দূরে রয়েছে, সম্রাটও দূরে রয়েছেন। কাছের প্রবীণ ব্যক্তিরাই সম্রাটের প্রতিনিধি।

॥ আইন-কানুন ॥

চীনারা বিশ্বাস করতো যে, কতকগুলি আইন পাস করলেই যে সরকার ভালমত চলবে, তা ঠিক নয়। কনফুসিয়াসের শিক্ষায় তারা শিখেছিল যে, মানুষ আইনের চেয়ে অনেক বড়; অধিকারের চেয়ে কর্তব্য বড়। ব্যক্তির চেয়ে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র অনেক বড়। তারা মনে করতো যে, পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হবে। তারা বংশধারায় বিশ্বাসী ছিল। পুরুষেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো। নারীরা এখানে বেশ উপেক্ষিতা ছিলেন। চীনে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল।

তাঙ্‌ আমলের চীনে ভূমি-ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সম্রাট ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যেত যে, খাস জমি বাদ দিয়ে অন্যান্য জমি নয়টি সমানভাগে বিভক্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হতো। চীনে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় জমির বিলি-বন্দোবস্ত করা হতো। এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। সাধারণতঃ বছরে দুবার করে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হতো।

চীনে 'পাও-চিয়া' নামে একটি ব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয় ছিল। দশটি পরিবার নিয়ে গঠিত সংস্থাকে 'পাও' বলা হতো। স্থানীয় লোকদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, এ সংস্থার লক্ষ্য ছিল।

॥ শিক্ষা ॥

এই যুগে চীনে সরকারী খরচে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো না। ধনী অভিজাতরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের দানে কিছু কিছু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ তেমন পেত না। তবে নিরক্ষর ব্যক্তিরাও জীবিকানির্বাহের জন্য কোন বৃত্তি শিখতে পারলে প্রশংসা লাভ করতো। অন্যান্য প্রাচীন দেশের মত চীনেও প্রাচীন লেখকদের গ্রন্থসমূহ খুব সমাদৃত হতো। কন্‌ফুসিয়াসের গ্রন্থের অংশ বিশেষ কেউ মুখস্থ করতে পারলেই পণ্ডিত হিসাবে গণ্য হতেন। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের পঠন-পাঠন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে রাজ-সরকারের বড় বড় চাকরিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। ধনীপরিবারের ছেলেরাই এই সব পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতেন।

॥ কাব্য-সাহিত্য ॥

এই যুগে প্রায় হাজার খানেক কবির নাম জানা যায়। তবে তাঁদের মধ্যে লি-পো, তু-ফু ও পো-চুই—এই তিনজন কবি ছিলেন

খুবই প্রসিদ্ধ। লি-পো ছিলেন মূলতঃ গীতি-কবি। 'আমি একটি পীচ গাছ!'—এই নামের একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন: 'তরবারি দিয়ে নদীর স্রোতধারাকে কি দুভাগে কাটতে পার? তোমার তরবারি যতই ধারাল হোক না কেন, আমার ভাবনাকে কিছুতেই দুখান করে কাটতে পারবে না।' তু-ফুর কবিতায় দুঃখ বেদনাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। না খেতে পেয়ে তাঁর দুটি ছেলে মারা গিয়েছিল, কবি এ দুঃখ কখনই ভুলতে পারেননি। 'যুদ্ধের রথ' নামে একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন: 'সৈন্যেরা রথে চড়ে যুদ্ধে যাচ্ছে। তাদের বাপ-মা, বউ-ছেলেমেয়েরা রথ আগলে বুক চাপড়ে কাঁদছে। পথের দুপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছ? তারা উত্তর দিল, 'আমাদের নামের পাশে শূন্য বসিয়ে দাও, আমরা আর ফিরবো না।' পো-চুইয়ের কবিতায় সে সময়ের সমাজের কথাই বেশি স্থান পেয়েছে। 'আমি একজন বন্দী' এই কবিতায় তিনি লিখেছেন: 'আমি একজন চীনাভাই। তাতারদের সঙ্গে দেশের জন্য লড়াই করে তাদের হাতে বন্দী হই। তাদের বন্দী শিবিরে বহুদিন ছিলাম। সেখান থেকে পালিয়ে বহু কষ্টে দেশে ফিরলাম। কিন্তু আমার চীনা ভাইয়েরা আমায় কেউ চিনলো না! সম্রাটের আদেশে আবার বন্দী হয়ে এসেছি উয়ে-উপত্যকার এই বন্দী শিবিরে।'

॥ চা-পানের প্রচলন ॥

অষ্টম শতাব্দী থেকে চীনের দক্ষিণাঞ্চলে উৎকৃষ্ট পানীয় হিসাবে চায়ের প্রচলন হয়। ধীরে ধীরে গোটা চীনে চা-পান জনপ্রিয় হয়। কবি লি-পো চা-পান করতে খুব ভালবাসতেন। চায়ের পেয়ালা নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন।

॥ অন্যান্য কারিগরি শিল্প ॥

চা-পানের সঙ্গে চায়ের পেয়ালা তৈরি শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠে। চীনা মাটি দিয়ে চায়ের পেয়ালা এবং সুন্দর সুন্দর বাসন তৈরির

কাজ সম্ভবতঃ তাঙ্-যুগ থেকেই শুরু হয়। চায়ের পেয়ালা ও বাসনগুলি নানা রং-এ চিত্রিত করার কাজে নতুন নতুন শিল্পরীতি প্রবর্তিত হতে থাকে।

এই যুগেই কাগজের ব্যবহার এবং ছাপার কাজ চীনে আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম ছাপার কাজে কাঠের ব্লক্ ব্যবহৃত হতো। এখন যেমন কাঠের উপরে নরুন দিয়ে নানা জিনিস খোদাই করা হয় তেমনি ছাপার অক্ষরগুলি কাঠের ব্লকে উৎকীর্ণ হতো, তারপরে ছাপান হতো। পরে ছাপার কাজে ধাতুর তৈরি অক্ষরের প্রচলন শুরু হয়।

॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ॥

তাঙ্ রাজত্বে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। চীনা নাবিকেরা ছোট ছোট জাহাজে সমুদ্র-পথে নানাস্থানে বাণিজ্য করতে যেত। ভারত মহাসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকার নানা বন্দরে তাদের ছোট ছোট জাহাজগুলি ভিড়তো। সেখানে তাদের পণ্য বিক্রি হতো এবং তাদের দেশের চাহিদা অনুসারে বিদেশী পণ্য ক্রয় করা হতো।

চীনের শতকরা আশিভাগ লোকের জীবিকা ছিল কৃষি। বন্যা, খরা ও মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধ করে চীনা কৃষকেরা জমিতে নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন করতো। তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। জমি চাষের সময়ে এবং অজন্মার বছরে চড়া সুদে তারা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতো। উত্তর চীনে যব, মিলেট্ এবং দক্ষিণ চীনে নদী-উপত্যকা প্রদেশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো। পার্বত্য অঞ্চলে চায়ের উৎপাদন হতো। চীনে প্রচুর তুলার চাষ হতো।

॥ বৌদ্ধধর্মের প্রচার ॥

তাঙ্ যুগে বৌদ্ধ মহাজন মতবাদ চীনে প্রচারিত হয়েছিল। সমুদ্র-পথে দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন বন্দরে এবং মধ্য এশিয়া থেকে হাঁটা-পথে

দলে দলে চীনের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতীয় ধর্ম-প্রচারকেরা। সম্রাট ও বড় বড় ধনী পরিবারের লোকেরা এই ধর্মে প্রথমে দীক্ষা লাভ করেন। বৌদ্ধমন্দির নির্মাণে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হতো। বৌদ্ধমঠে সাধুর জীবন বরণ করতে ধনীর দুলালেরাও ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতেন।

বৌদ্ধদর্শনের পঠন-পাঠন কেবলমাত্র পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের নানা রচনায়, বিভিন্ন কলা-বিদ্যা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বৌদ্ধ-রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে চীনা-শব্দবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার জনপ্রিয়তাও চীনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মে পরিণত হওয়ায় ধর্মনৈতিক ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিও দৃঢ়তর হয়। তবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ রাজনীতিতে আগ্রহ দেখাতেন না।

বৌদ্ধ মন্দিরে ধন-ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজকর্মচারীরা বৌদ্ধসাধুদের উপরে কড়া নজর রাখতেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে সম্রাটেরাও এই ধর্ম সম্বন্ধে আর উদারতা দেখাতে চাইলেন না। এই ধর্মকে বলা হলো বিদেশী এবং এই ধর্মের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ছড়ানো হতে লাগলো। সম্রাট উয়াঙ্‌-সুঙের আমলে (৮৩৮-৮৪৬ খ্রী.) বৌদ্ধপুরোহিতেরা কঠোরভাবে নির্যাতিত হতে থাকেন। সম্রাটের আদেশে প্রায় পাঁচ হাজার বৌদ্ধ মঠ ভেঙে ফেলা হল ; প্রায় আড়াই লাখের মত পুরোহিত সাধারণের মত খেটেখুটে খেতে বাধ্য হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের নানা উৎসবে প্রচুর জনসমাবেশ হতো। মন্দিরে যখন পুরোহিতেরা বৌদ্ধ-স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করতেন সেগুলি শোনার জন্য মন্দিরে ভীড় জমে উঠতো। অনেকেই হয়তো স্তোত্রের অর্থ বুঝতে পারতো না, কিন্তু সেগুলি শুনতে পারলে ধর্মলাভ হবে, এই কামনাতেই মন্দিরে মন্দিরে ছুটাছুটি করতো।

॥ প্রতিবেশী রাজ্যে চীনা-সভ্যতা ॥

তাঙ্ যুগকে মধ্যযুগের চীনের ইতিহাসে স্বুবর্ণযুগ বলা যায়। সপ্তম শতাব্দী থেকে প্রায় দুশো বছর ধরে চীনের সভ্যতাকে কেবলমাত্র চীনের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়নি, প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিও চীনের সমকক্ষ হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

দূর-প্রাচ্যে একমাত্র চীন ছিল তখন সভ্যতার ধারক ও বাহক। চীনের দক্ষিণে ভিয়েত্‌নামের আন্নাম নগরের প্রাচীন গৌরবের উৎস ছিল চীনা-সভ্যতা। পূর্বাঞ্চলে চীনের প্রতিবেশী কোরিয়ার অধিবাসীরাও চীনের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছিল। কোরিয়া থেকে জলপথে জাপানের দূরত্ব মাত্র একশো পনের মাইল। সেখান থেকে জাপানে চীনা-সভ্যতার প্রচার হয়। চীন-জাপানের সংস্কৃতির সেতুস্বরূপ ছিল কোরিয়া। কোরিয়ার অধিবাসীরা জাপানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেত, কেউ আসতো জাহাজে নাবিক হয়ে, আবার কেউ যেতো জাপানের উর্বর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী ধরে চীনা-সভ্যতার প্লাবনে জাপান ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু নবম শতাব্দী থেকে জাপানে জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জাপান আর চীনের মুখাপেক্ষী থাকতে চাইলো না। কিন্তু যে গাছটি একবার মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে তাকে কেটে ফেললেও অন্যদিক থেকে সে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। জাপানের বেলায় চীনা-সভ্যতার প্রভাব ঠিক সে-রকমই ছিল।

॥ হিউয়েন-সাঙ্ ॥

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনেকে চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে

হিউয়েন-সাঙের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ ভারতে এসেছিলেন।

চীনের হোনান প্রদেশে হিউয়েন-সাঙের জন্ম হয়। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি লো-ওয়াঙ্ বৌদ্ধমঠে যোগ দিয়েছিলেন। বিশ-বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে চীনের অনেক বৌদ্ধমঠে ভ্রমণ করেছিলেন বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও জ্ঞানলাভের কামনায়; কিন্তু চীনদেশে তাঁর জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত হল না। তখন বিদেশ-যাত্রা চীনে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে সম্রাটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তিনি ভারতের পথে বের হয়ে পড়লেন। নানা বাধা-বিপদ অতিক্রম করে তিনি ভারতে উপস্থিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এখানে অবস্থান করে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছিলেন, ভারতের অনেক জ্ঞানী-গুণীর সংস্পর্শে এসে-ছিলেন। ভারতের অনেক রাজা-মহারাজা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন। ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারত থেকে বহু বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি, বুদ্ধের স্মৃতিজড়িত অনেক নিদর্শন তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতে অবস্থান কালে তিনি যে দিন-পঞ্জী লিখে রেখেছিলেন পরবর্তীকালে বিশিষ্ট চীনা লেখকেরা তার অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ পাঠ করে ভারতীয় ইতিহাসের সমসাময়িক অনেক ঘটনা আমরা জানতে পারি।

পরিণত জীবনে তিনি চীনের নানা স্থানে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বক্তৃতা ও আলোচনা করে সময় অতিবাহিত করতেন। এই সময়ে তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

(খ) চীনে সুঙ্ বংশ (৯৬০-১২৮০ খ্রী.)

তাঙ্-যুগের শেষদিকে চীনে নানা অশান্তি দেখা দিয়েছিল। বহিরাগত শত্রুদের আক্রমণেও চীন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। মধ্য-এশিয়ার খিতান নামে এক মঙ্গোল-জাতির আক্রমণে মঙ্গোলিয়া

ও মাঞ্চুরিয়া চীনের হাতছাড়া হলো। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চীনে চলেছিল অরাজকতা। সুঙ্ বংশের সম্রাটেরা চীনে পুনরায় শান্তি স্থাপন করেছিলেন; কিন্তু সমগ্র চীন এক সম্রাটের শাসনাধীন থাকবে, এই ধারণা আর টিকে রইলো না। উত্তর ও পশ্চিমে চীনের প্রাচীরকে দৃঢ়তর করা হলো; কিন্তু তা সত্ত্বেও চীনের সীমানা দিন-দিনই সংকুচিত হয়ে পড়লো। উত্তরে 'হোপি' এবং উত্তর-পশ্চিমে 'সাঙ্সি' প্রদেশ আর চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রইলো না। দক্ষিণ দিকে কিন্তু সুঙ্-সম্রাটদের অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে সুঙ্-সম্রাটের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বংশের তরুণ-সম্রাট সেন-সুঙ্ ১০৬৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং চীনের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। তিনি ওয়াঙ্ আন্-সি নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।

ওয়াঙ্ আন্-সি যখন প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলেন তখন চীনের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। রাজকোষে অর্থাভাব থাকলেও সামরিক বাহিনীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতো। রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ। বড় বড় জমিদারেরা রাজস্ব জমা দিতে না পারলেই সুখী হতেন। ছোট ছোট জমিদারেরা রাজকোষে টাকা জমা না দিয়ে তাঁদের উর্ধ্বতন জমিদারদের কিছু টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে চাইতেন। ফলে রাজকর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষকেরা ছিল দরিদ্র; কিন্তু পারিবারিক উৎসবের জন্য খরচ কমানো তারাও পছন্দ করতো না। প্রয়োজন হলেই জমিদার ও মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে তারা টাকা কর্জ করতো।

॥ জনহিতকর কাজ ॥

ওয়াঙ্ আন্-সি জাতীয় আয় বৃদ্ধি করার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য

দিলেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলি জনসাধারণের উপকার করেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যকে সম্রাটের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা হলো। সরকার সর্বদাই খাদ্য-শস্য মজুত রাখতেন। ফসল নষ্ট হলেও দেশে যাতে খাদ্যাভাব দেখা দিতে না পারে এই জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কৃষকদের প্রয়োজন মত সরকার থেকে কম সুদে টাকা ধার দেওয়া হতো। জবরদস্তি করে বেগার খাটানো নিষিদ্ধ হলো। জিনিস-পত্রের দাম বেঁধে দেওয়া হলো।

যাতে কেউ কর ফাঁকি দিতে না পারে এজন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলো। স্থাবর-অস্থাবর সবরকমের সম্পত্তির উপরে কর বসানো হলো; সমস্ত সম্পত্তির হিসাব করে আনুপাতিক হারে কর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ধনী জমিদারদের উপরেই করের বোঝা বেশি চাপান হয়েছিল। এসব কারণে অনেকেই মনে করেন যে, তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলির মধ্যে আধুনিক সাম্যবাদের বীজ নিহিত ছিল।

॥ সাধারণের জীবনযাত্রা ॥

সুঙ্‌ আমলে সাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত ছিল। দরিদ্রেরা এখন আর পূর্বের মত অবহেলিত ছিল না। তাদের ঘর-বাড়ি আসবাবপত্রের চেহারা ফিরে গিয়েছিল। এ যুগের সাঙ্‌ উঙ্‌ তাই গর্ব করে বলেছিলেন: 'আমি সুখী, খুবই সুখী। আমি একজন চীনা, মোটেই বর্বর নই। আমি মানুষ। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা শহর লো ওয়াঙ্‌-এ আমি বাস করছি।'

॥ শিক্ষা ও সংস্কৃতি ॥

সুঙ্‌-আমলে নাগরিকেরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারতো। এ সময়ে ছাপানো বইয়ের দাম কমে গিয়েছিল। জনসাধারণ সহজেই এসব বই পেতো। দেশের নানা স্থানে

পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল। তাঙ্ আমলে কাব্যসাহিত্যের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল, এ আমলে বৃদ্ধি পেয়েছিল গদ্যসাহিত্যের চর্চা। আরবীয় বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে চীনারা বিজ্ঞানপাঠে উৎসাহিত হয়েছিল। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা এযুগে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসার ফলে গণিতশিক্ষার দিকেও চীনাদের লক্ষ্য পড়েছিল। চীনারা এ সময় থেকে মাতৃভাষায় ছোট ছোট উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত হয়েছিল। ইতিহাস রচনাতেও তারা পেছিয়ে ছিল না।

চীনা মাটির নানা কাজে এ সময়ে বিচিত্র রং-এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। চিত্রবিদ্যায় এ আমলে নানা উন্নতি দেখা যায়। সুঙ্ যুগের চিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ফুল, পাখি ও বিভিন্ন জন্তুর চিত্র শিল্পীর হাতে বাস্তব রূপ পেতো। ধর্মীয় চিত্রে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি-অঙ্কন প্রাধান্য লাভ করেছিল। সুঙ্ যুগের চিত্রাবলী দেখে মনে হয় শিল্পীরা যেন এখানে তাঁদের প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন।

ধর্ম সম্বন্ধে নতুন কন্‌ফুসিয়াসের মতবাদ প্রবর্তিত হতে থাকে। এযুগের দার্শনিক চু-সি নতুন করে কন্‌ফুসিয়াসের মতবাদকে যথেষ্ট সরল ও সহজভাবে প্রকাশ করলেন। এযুগে ধর্মে সমন্বয়ের আদর্শ গৃহীত হয়। কন্‌ফুসিয়াস, লাওসে ও বুদ্ধের মতবাদকে সমন্বিত করা হয়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা এযুগে খুবই লক্ষণীয়।

সুঙ্ আমলের সংস্কৃতিতে তাঙ আমলের মন-ভুলানো রূপ ছিল না। ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের জৌলুস বেশ কমে গিয়েছিল। এযুগের সংস্কৃতিতে বাস্তবের প্রভাব বেশি, সংহতি ও সমন্বয়ের দিকে চীনারা বেশ ঝুঁকে পড়েছিল।

(গ) মঙ্গোলদের কথা

সুঙ্ আমলের পূর্ব থেকেই উত্তর চীনে মঙ্গোলদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। মঙ্গোলেরা প্রথমে ছিল যাযাবর। পশুপালন ও শিকার ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। তাদের প্রকৃতি ছিল বড় নিষ্ঠুর ; যুদ্ধে তাদের হটানো সহজ ছিল না।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মঙ্গোলেরা চেঙ্গিস খাঁর অধীনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর সাহায্যে চেঙ্গিস্ খাঁ চীনের উত্তরাংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ভারতের তুর্কী সুলতান ইলতুৎমিসের বিচক্ষণতার ফলে চেঙ্গিসের আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পেয়েছিল। চেঙ্গিস্ রাশিয়ার দক্ষিণ অংশও জয় করেছিলেন ; ফলে এশিয়া ও ইউরোপের কতকাংশ নিয়ে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

চেঙ্গিসের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ওগ্‌দাই খাঁ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে থাকেন। কিন্তু ওগ্‌দাই হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসন নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ঘোর অশান্তি দেখা দেয়। ১২৫২ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গু খাঁ মঙ্গোলদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভাই কুবলাই খাঁকে মঙ্গোল-বিজিত চীনের শাসক-পদে নিযুক্ত করেন।

॥ চীনে ইউনান বংশ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রী.) ॥

মঙ্গু খাঁর মৃত্যুর পর কুবলাই খাঁ মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হলেন। তাঁর সময়ে প্রায় সমগ্র চীন মঙ্গোলদের অধিকারে চলে আসে। মঙ্গোলেরা কিন্তু চীনা সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কুবলাই খাঁ চীনের পিকিং শহরে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় থেকে মঙ্গোল সাম্রাজ্য মোটা-মুটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করেন কুবলাই খাঁ আর পশ্চিমে রাজত্ব করেন চেঙ্গিসের এক পৌত্র হলাগু। অনেকদিন চীনে থাকার ফলে কুবলাই খাঁ মনেপ্রাণে চীনা হয়ে যান।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইউনান বংশ নামে পরিচিত হয়। কুবলাই নিজেকে 'স্বর্গের পুত্র' বলে পরিচিত করতেন। টংকিন, আন্নাম, ব্রহ্মদেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তিনি জাপান ও মালয় জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁর আমলে এশিয়া ও ইউরোপ এই দুই মহাদেশব্যাপী এক বিরাট অঞ্চলে মঙ্গোল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পশ্চিম ইউরোপকে কখনও কুবলাইয়ের সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ভারতেও তিনি সাম্রাজ্য প্রসারে সমর্থ হননি। ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দে কুবলাই খাঁর মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইউনান বংশের কর্তৃত্ব লুপ্ত হয়।



কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের তিব্বতীয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিব্বতীয়েরা এই সময়ে বৌদ্ধতন্ত্রে আগ্রহী হয়েছিল এবং তন্ত্রমতে অনেক বৌদ্ধ দেব-দেবীর পূজা প্রচলন করেছিল।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত

মার্কো পোলো ছিলেন একজন ইটালীয় পরিব্রাজক। তিনি দীর্ঘকাল কুবলাই সাম্রাজ্যে বসবাস করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আমরা কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি।

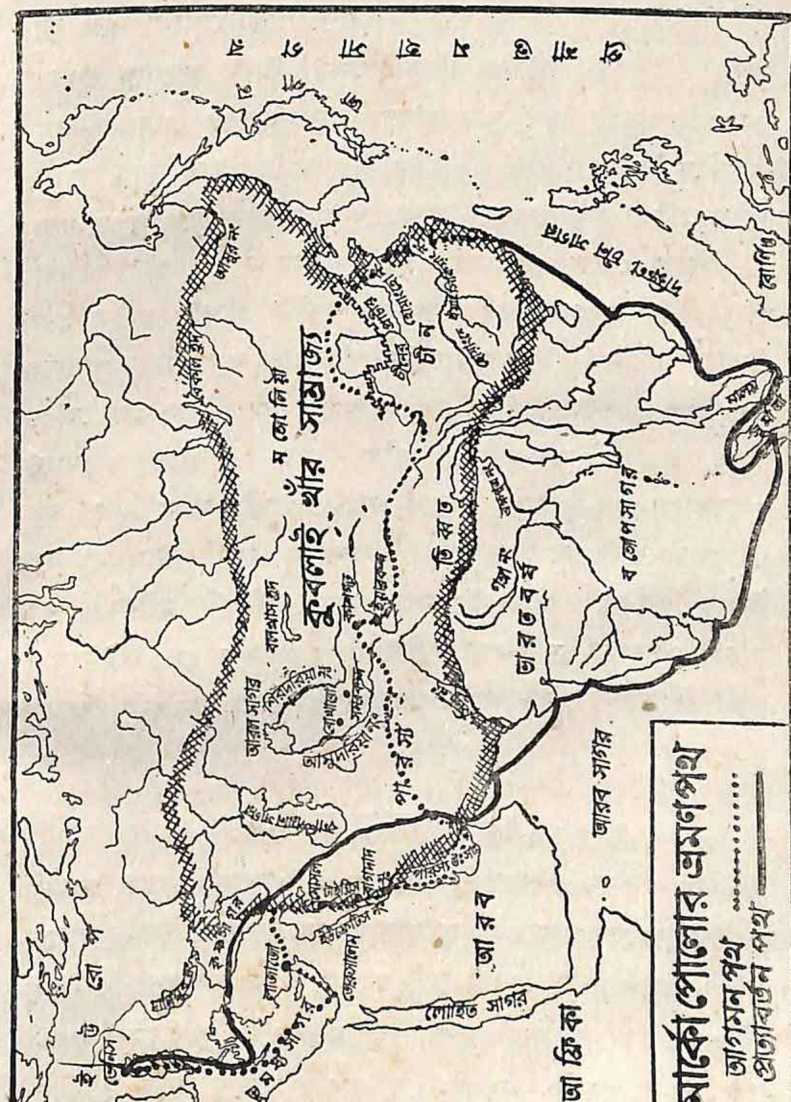
মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বলেন ঃ মঙ্গোল-সম্রাটেরা ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। বিশেষ করে কুবলাই খাঁর পিকিং রাজদরবারের দ্বার খোলা থাকতো দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের জন্য। একবার ভেনিস্ শহরের দুজন বণিকও সেখানে যান। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই, নিকোলো পোলো এবং মাফিও পোলো। একবার বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁরা বোখারায় যান। সেখানে তাঁদের দেখা হয় কুবলাই খাঁর দূতের সঙ্গে। তিনি দুই ভাইকে কুবলাই-এর দরবারে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে তাঁরা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কুবলাই খাঁর রাজধানীতে আসেন। কুবলাই তাঁদের পেয়ে খুব খুশি হন। তিনি তাঁদের কাছে খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি কয়েকজন খ্রীস্টান পণ্ডিতকে তাঁর দরবারে আনতে পোলো ভাইদের ইউরোপে পাঠিয়ে দেন। এবার তাঁদের সঙ্গে এলো নিকোলো পোলোর সতের বছর বয়সের পুত্র মার্কো পোলো। মার্কো পোলো মঙ্গোলদের ভাষা শিখে নিলেন। মার্কোকে কুবলাই-এর খুব ভাল লাগে। পরে তিনি মার্কোকে হ্যাংচাও শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।



মার্কো পোলো

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী থেকে তখনকার চীনদেশ সম্পর্কে নানান্ কথা জানা যায়। মার্কো পোলো তাঁর বিবরণীতে বলেন, তখন পিকিংয়ের নাম ছিল কাম্বালাক এবং উত্তর চীনের নাম ছিল ক্যাথে। প্রভূত সমৃদ্ধিশালী ছিল এই চীন দেশ ; সুন্দর সুন্দর বাগান, মাঠ, আঙুরের খামার ছিল দেশের সর্বত্র। মার্কো পোলো যে হ্যাংচাও শহরের শাসনকর্তা ছিলেন, সেখানে দোকান-

পাট, পাকা রাস্তা, চওড়া খাল, বহু সেতু, বড় বড় হাট-বাজার, গুদাম, সাধারণের স্নানের জন্য বৃহৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল।



ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে মার্কো পোলো বিশাল সৈন্যবাহিনী ও হস্তিবাহিনী দেখেছিলেন এবং ঐ হস্তিবাহিনী মঙ্গোল তীরন্দাজদের

হাতে কিভাবে পরাজিত হয়, তার এক বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন।

পিকিং থেকে কুবলাই খাঁর আদেশে মার্কো পোলো এবং তাঁর বাবা ও কাকা পারস্যে গিয়েছিলেন। তাঁরা জলপথে সুমাত্রা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ঘুরে দু'বছর পরে পারস্যে এসে পৌঁছান। এ সময়ে তাঁরা ভারতেও কিছুদিন থাকেন। দক্ষিণ ভারতের এক শক্তিশালিনী রানীর কথাও মার্কো পোলোর বিবরণীতে পাওয়া যায়।

পারস্য থেকে পোলোরা দেশে ফিরে যান। তাঁদের সবার পরনে ছিল মঙ্গোলদের পোশাক। তাই তাঁদের প্রথমে কেউ চিনতে পারেনি। আত্মীয়-স্বজনদের নিজেদের কথা বিশ্বাস করাবার জন্য তাঁরা বিদেশী পোশাক খুলে ফেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে মহামূল্য মণি-মাণিক্য, হীরা, পান্না ও জহরত। মার্কো পোলোর দেশ-বিদেশের গল্পকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ধন-সম্পদের কথা বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। তাঁরা তাঁর নাম দেন কোটিপতি মার্কো। পরে মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইউরোপে সমাদৃত হয়। ইউরোপবাসী এই বৃত্তান্ত পাঠ করে প্রাচ্যদেশের নানা কাহিনী জানতে পারলো।

(ঘ) মধ্যযুগে জাপান

পর্বত-বন-হ্রদ ও বেগবতী নদীর দেশ জাপান। তার চারদিক সাগর দিয়ে ঘেরা রয়েছে। জাপানের মধ্যে রয়েছে কয়েকটা আগ্নেয়গিরি। জাপানীদের সব সময়েই আতঙ্ক, কখন ভূ-কম্পন ও অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়। জাপানের দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বে হন্‌সু, কুয়া-সু ও সি-কো-কু প্রভৃতি অঞ্চলে লোকবসতি বেশি গড়ে উঠেছিল। উপকূল প্রদেশে বসবাসের ফলে প্রথম থেকেই জাপানীরা কষ্টসহিষ্ণু, বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

মধ্যযুগের প্রথম দিক থেকেই জাপানে কয়েকটি অভিজাত পরিবারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপের সামন্তপ্রথার অনুরূপ না হলেও এখানকার অর্থনীতি মুষ্টিমেয় অভিজাত পরিবারের



মধ্যযুগে জাপান

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ভূ-সম্পত্তিতে তাঁদেরই অধিকার ছিল। অভিজাত সন্তানেরা ছিলেন যুদ্ধনিপুণ। ছোট-খাট জমিদারেরা অভিজাতদের পক্ষে যুদ্ধ করতে, তাঁদের সেবা করতে বাধ্য হতেন। জাপানী সমাজের সর্বনিম্নে ছিল দরিদ্র ভূমিদাস-সম্প্রদায়।

॥ জাপানের সম্রাট ॥

জাপানকে 'নিপ্পন' বা দীপ্যমান সূর্যের দেশ বলা হয়। এখানে প্রবাদ আছে যে, সূর্যদেবী এক সময়ে নিনিঙ্গো-নো-মিকোটু নামে

তাঁর এক নাতিকে কুয়া-সু দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন একখানি ধারালো তলোয়ার, কিছু মণি-মুক্তো আর একখানি আয়না। নিনিঙ্গোর পৌত্র জিম্মি-টেন্নো হলেন জাপানের প্রথম সম্রাট বা 'মিকাডো'। জাপানের সম্রাট নিজেকে সূর্যদেবীর অংশ বলে দাবি করে থাকেন। তাঁকে সেবা করার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল থাকতেন অভিজাত সন্তানেরা। চীনের সম্রাটকে যেমন সকল গুণের আধার হতে হতো, জাপানের বেলায় তা ছিল না। সম্রাটের পদ ছিল বংশানুক্রমিক। তিনি অযাচিত করুণায় রাজ-সরকারের উঁচু পদগুলি অভিজাতদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এখানে বংশগত পরিচয়ই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

সম্রাট ও অভিজাতেরা যে ধর্মে বিশ্বাস করতেন তার নাম ছিল 'সিণ্টো' ধর্ম। 'সিণ্টো' হলো সহজভাবে প্রকৃতির পূজো। এই ধর্মে প্রাকৃতিক দেব-দেবীকে ভয় বা শঙ্কা না করে তাঁদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হতো। প্রকৃতির করুণায় জাপানীরা সব কিছু পেয়েছে, এই অনুভূতিই জাপানীদের ধর্মবিশ্বাসের মূলে ছিল।

জাপানে চীনা-সভ্যতার প্রভাব

দক্ষিণ হন্‌সুর ইয়ামোটো উপত্যকায় জাপানের রাজশক্তি প্রথমে দৃঢ় হয়। রাজধানী নারা নগরী চীনের রাজধানী চাঙ্-আনের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। চীনের শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ শাসন জাপানে প্রবর্তিত হয়েছিল। জাপানীরা চীনা-ভাষা শিখলো, চীনা-লিপির অনুকরণে নিজেদের লিপিমালা তৈরি করলো। জাপানে প্রথম ইতিহাস 'নি-হোঙ্গী' এবং পরবর্তী জাতীয় ইতিহাস 'রিক্কোকুশী' চীনা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। জাপানী সভ্যতার জনক যুবরাজ সোটোকু-টাইসু (৫৭৩-৬২১ খ্রী.) ছিলেন একজন চীন প্রেমিক। তাঁর চেষ্টায় কন্‌ফুসিয়াসের গ্রন্থসমূহ জাপানে জনপ্রিয় হয়। তিনিই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। জাপান থেকে দলে দলে

লোক চীনে যেতো অধ্যয়নের জন্য। আবার কেউ যেতো ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, এবং কেউ সেখানে জাপানের দূত হয়েও যেতো।

নবম শতাব্দী থেকে জাপান স্বজাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন থেকেই চীনা-সভ্যতাকে বিদেশী সভ্যতা বলে উপেক্ষা করা হয়েছিল।

॥ কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী পরিবার ॥

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত জাপানে 'সোগা'-পরিবারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোগা পরিবারের চেষ্টায় চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। তাই সম্রাট ও জনসাধারণের উপরে তাদের প্রভাব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নারা নগরীর প্রাধান্যের সময় থেকে 'ফুজিওয়ারা'-পরিবারের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। ফুজিওয়ারাদের প্রভুত্বের মূলে ছিলেন কামা-টোরি। তিনিই 'সোগা'দের উচ্ছেদ করে নিজ পরিবারের প্রভুত্বের সূচনা করেন। এই পরিবারের কন্যা সম্রাটেরা বিবাহ করতেন। নাবালক সম্রাটের রাজপ্রতিনিধি হিসাবেও এই পরিবার প্রভুত্ব করতেন। পরে সম্রাটকে সামনে রেখে এই মাতুল বংশীয় লোকেরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন।

॥ জাতীয়তাবাদ ॥

বিজাতীয় চীনা প্রভাব ও অভিজাতদের প্রভুত্ব মিকাডোর পক্ষে ক্রমশই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। মিকাডোকে কেন্দ্র করে জাপানে জাতীয় ভাবধারার প্লাবন এসে গেল। অভিজাতদের প্রভুত্ব থেকে জাপান নিজেকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। এখন থেকে মিকাডো প্রকৃতপক্ষে দ্বৈত ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তিনি হলেন একাধারে 'সিন্টো'র প্রধান পুরোহিত এবং জাপানের একচ্ছত্র সম্রাট। এই সময়ে নারা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো কিয়াটো নগরে। এই নগরটি হলো জাপানীদের কাছে 'শান্তির নগর'।

জাপানী বুদ্ধিজীবীরা 'সিন্টো' ও বৌদ্ধধর্মকে সমন্বিত করে বৌদ্ধধর্মকে জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত করলেন। এ কাজে বাধা দিয়েছিলেন অভিজাতরা; কারণ মন্দিরের সম্পত্তির উপরে তাঁদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু কোনো বাধাই টিকলো না।

॥ জাপানে 'সোগানী' প্রভুত্ব ॥

জাপানে শীঘ্রই সমর-নায়কদের প্রভুত্ব শুরু হলো। মিকাডো পূর্বের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও সমর-নায়কদের প্রভুত্ব তিনিও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এখানকার তায়রা ও মিনামোটো-পরিবারের অভ্যুত্থানের মূলে ছিল তাদের সামরিক শক্তি। এ দুটি পরিবার প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা না পেয়ে ভাগ্যান্বেষণে এ দুটি পরিবারের লোকেরা জাপানের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। ১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে ডান-নো-উরার নৌযুদ্ধে মিনামোটো পরিবারের ইউরোটোমো তায়রার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। বিজয়ী ইউরোটোমো মিকাডোর নিকট থেকে 'সোগান' উপাধি লাভ করলেন। 'সোগানে'র অর্থ হলো বর্বর-দমনকারী সেনানায়ক। সোগানরা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেও এ সময় থেকে সম্রাট ও সোগানকে নিয়ে আর এক নতুন ধরনের শাসন জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেন সোগান।

সোগানী আমলে কিয়োটো থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো কামাকুরায়। জাপানের বর্তমান রাজধানী টোকিওর কাছে কামাকুরা অবস্থিত। এই সময় থেকে জাপানে যুদ্ধপ্রিয় সামন্ত-সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। এই সমাজের কেন্দ্রে ছিল 'সামুরাই' নামে এক বিশ্বস্ত ও দুঃসাহসী যোদ্ধা সম্প্রদায়।

॥ সামুরাই ॥

চীনা ধরনের শাসনব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার ফলে জাপানে জমিদারদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এই সময়ে উপকূল প্রদেশে জলদস্যুদের উৎপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। চোর-ডাকাতদের অত্যাচার তো প্রায় লেগেই থাকতো। তাই জমিদারেরা নিরাপত্তার জন্য নিজেদের খরচে সৈন্যবাহিনী রাখতে বাধ্য হলেন।



সামুরাই

পূর্বের অভিজাতদের থেকে এই জমিদারেরা ছিলেন একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাঁদের শক্তির উৎস ছিল তাঁদের সামরিক বাহিনী। এই জমিদারদের বলা হতো 'ডেমিও', আর তাঁদের অনুগত যোদ্ধাদের বলা হতো 'সামুরাই'। সামুরাই-সম্প্রদায় জাপানের জনসংখ্যার শতকরা পাঁচভাগ হলেও অবশিষ্ট পঁচানব্বই জন জাপানীর উপরে তরবারির জোরে তারাই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

॥ বুসিডো ॥

সামুরাই-সম্প্রদায় সৈনিক জীবনে কয়েকটি কঠোর নিয়ম-নীতি পালন করতো। এই নিয়ম-নীতি বা আচরণ-বিধি লিপিবদ্ধ হয়েছিল 'বুসিডো'তে। এই 'বুসিডো'কে একখানি সামরিক আইন-সংহিতা বলা যেতে পারে। প্রত্যেক সামুরাইকে কোন প্রশ্ন না করে 'বুসিডো'র প্রত্যেকটি নির্দেশ পালন করতে হতো। প্রভুর প্রতি অনুগত থাকা, বিপদে চঞ্চল না হওয়া, চরিত্রে ধীর স্থির সংযত থাকা ছিল সামুরাইয়ের কর্তব্য। 'বুসিডো'তে পরাজিত বিক্ষুব্ধ সৈনিকের আত্মহত্যা বা 'হারা-কিরি'র নির্দেশ ছিল—এমনকি

প্রভুর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে কিভাবে সম্মান দেখাতে হবে তার নির্দেশও থাকতো। সামুরাইদের সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো 'বুসিডো'র নির্দিষ্ট পন্থায়।

সামুরাই-সম্প্রদায় পালন করতো জেন-বৌদ্ধধর্ম। এই মতবাদে অনুষ্ঠানের কোন বাহুল্য থাকতো না। নিজের চেষ্টায় ধর্মজীবনকে উন্নত করার শিক্ষা দিয়েছিল জেন ধর্ম।

ইউরোপের সামন্তশ্রেণীর যেমন অলঙ্কার স্বরূপ ছিল নাইট্ সম্প্রদায়, তেমনি ছিল জাপানী সামন্তদের সামুরাই-সম্প্রদায়। নাইট্‌দের মতই ছিলেন তাঁরা কর্তব্যপরায়ণ। ধারালো তরবারি ছিল তাঁদের একমাত্র বন্ধু। ইস্পাতের মতো শক্ত ছিল তাঁদের মন। আবেগ, প্রবৃত্তি বা কোন অনুভূতির প্রেরণায় সামুরাইয়েরা কখনই অভিভূত হতেন না। ঐকান্তিক নিষ্ঠায় কর্তব্য পালন করাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। তাঙ্ যুগে চীন কতটা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল? এই যুগে আইন-কানুন কিরূপ ছিল?

২। তাঙ্ যুগে শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? এই যুগের তিনজন প্রসিদ্ধ কবির নাম কর ও তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কি জান?

৩। তাঙ্ যুগে কারিগরী শিল্পের কিরূপ প্রসার ঘটে? এই যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি ঘটেছিল?

৪। তাঙ্ যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্বন্ধে কি জান?

৫। হিউয়েন সাঙ্ কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৬। ওয়াঙ্-আন্-সি কে ছিলেন? তিনি কি কি জনহিতকর কার্য করেছিলেন?

৭। সুঙ্ আমলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কিরূপ প্রসার ঘটেছিলা?

৮। চীনে ইউনান বংশ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কুবলাই খাঁ সম্বন্ধে কি জান?

৯। মার্কো-পোলো কে ছিলেন? তিনি চীনদেশ সম্বন্ধে কি লিখেছেন?

১০। জাপানের কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী পরিবারের নাম উল্লেখ কর।

১১। জাপানে সোগানী প্রভুত্ব সম্বন্ধে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। দূর-প্রাচ্য বলতে কি বোঝ?

২। তাঙ্ বংশীয় রাজারা কত বৎসর রাজত্ব করেন? তাঁদের রাজধানী কোথায় ছিল?

৩। তাঙ্ বংশের একজন খ্যাতনামা সম্রাটের নাম কর।

৪। তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল?

৫। মিঙ্ হুয়াঙ্ কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব কি ছিল?

৬। চীনের অধিবাসীদের সম্রাট সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল?

৭। তাঙ্ যুগে চীনের শাসনব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হত?

৮। কন্ফুসিয়াস কি শিক্ষা দিয়েছিলেন?

৯। পাও-চিয়া কাকে বলে?

১০। চীনে শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল?

১১। তাঙ্ যুগে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির নাম কর।

১২। লি-পোর কবিতার বিষয়বস্তু কি ছিল?

১৩। তু-ফুর লেখা একটি কবিতার নাম কর। তাতে তিনি কি লিখেছিলেন?

১৪। পো-চুই-এর কবিতার বিষয়বস্তু কি ছিল?

১৫। চীনে চা-পানের প্রচলন কিভাবে হয়?

১৬। তাঙ্ যুগে কিভাবে ছাপার কাজ শুরু হয়?

১৭। তাঙ্ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?

১৮। তাঙ্ যুগে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা চীনে কিরূপ বিস্তার লাভ করেছিল?

১৯। কোন্ সম্রাটের আমলে পাঁচ হাজার বৌদ্ধ-মঠ ভেঙে ফেলা হয় এবং কেন?

২০। বৌদ্ধধর্মের নানা উৎসবে মন্দিরে জনসমাবেশ হতো কেন?

২১। মধ্যযুগে চীনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ কোন্‌টি?

২২। প্রতিবেশী কোন্ কোন্ রাজ্যে চীনের সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে?

২৩। জাপানের উপর চীনা-সভ্যতার প্রভাব কতখানি বিস্তারলাভ করেছিল?

২৪। হিউয়েন-সাঙ্ কে ছিলেন? তিনি কখন ভারতে আসেন?

২৫। হিউয়েন-সাঙ্ কিভাবে ভারতের পথে বাহির হন?

২৬। হিউয়েন-সাঙ্ কত বছর ভারতে ছিলেন?

২৭। সমসাময়িক ভারতের ইতিহাস জানতে হিউয়েন-সাঙ্ কিভাবে সাহায্য করেছেন?

২৮। তাঙ্ বংশের পর কোন্ বংশ চীনে রাজত্ব করেছিল?

২৯। সুঙ্-বংশের প্রথম সম্রাট কে ছিলেন? তিনি কাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন?

৩০। সুঙ্ বংশের রাজত্বকালে চীনের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?

৩১। ওয়াঙ্-আন্-সি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন?

৩২। কর ফাঁকির ব্যাপারে ওয়াঙ্-আন্-সি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন?

৩৩। সুঙ্ আমলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা কিরূপ উন্নত ছিল?

৩৪। সুঙ্ আমলে শিক্ষা-ব্যবস্থার কি উন্নতি সাধিত হয়েছিল?

৩৫। সুঙ্ যুগে চিত্রাবলী দেখে কি মনে হয়?

৩৬। সুঙ্ আমলে একজন দার্শনিকের নাম কর।

৩৭। মঙ্গোল কারা? তাদের প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

৩৮। মঙ্গোলদের এক দুর্ধর্ষ নেতার নাম কর। তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল?

৩৯। ওগদাই খাঁ কে ছিলেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল?

৪০। কুবলাই খাঁ কে ছিলেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল?

৪১। কুবলাই খাঁর বংশের নাম কি ছিল? তিনি নিজেকে কি নামে পরিচিত করতেন?

৪২। কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কোথা থেকে জানা যায়?

৪৩। মার্কো পোলো কিভাবে কুবলাই খাঁর দরবারে আসেন?

৪৪। মার্কো পোলো চীনদেশ সম্বন্ধে কি লিখেছেন ?
৪৫। মার্কো পোলো কাদের সঙ্গে কিভাবে পারস্যে এসে পৌছান ?
৪৬। "কোটিপতি মার্কো" নাম কিভাবে হয়েছিল ?
৪৭। মধ্যযুগে জাপানী অভিজাতদের অবস্থা কিরূপ ছিল ?
৪৮। কোন্ দেশকে নিপ্পন বলা হয় ?
৪৯। জাপানে প্রথম সম্রাট কে ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?
৫০। সিণ্টো কাকে বলে ?
৫১। জাপানী সভ্যতার জনক কে ?
৫২। কাদের চেষ্টায় চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ?
৫৩। কে কার নিকট থেকে সোগান উপাধি লাভ করেন ?
৫৪। 'সোগান' কথাটির অর্থ কি ।
৫৫। কামাকুয়া কোথায় ?
৫৬। সামুরাই কাকে বলা হয় ?
৫৭। বুসিডো কি ?
৫৮। সামুরাই-এর কর্তব্য কি ছিল ?
৫৯। সামুরাইদের সঙ্গে ইউরোপের কোন্ সম্প্রদায়ের তুলনা করা চলে ?
৬০। সামুরাইদের জীবনের লক্ষ্য কি ছিল ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) তাঙ্-দের রাজধানী ছিল — ।
(খ) উত্তর ভারতের হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন চীনের — ।
(গ) ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লেমেনের সমকক্ষ ছিলেন চীন সম্রাট — ।
(ঘ) বৌদ্ধ পুরোহিতরা নির্যাতিত হয়েছিলেন — এর আমলে ।
(ঙ) — যুগ ছিল মধ্যযুগের চীনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ।
(চ) চীন — জাপানের সংস্কৃতির সেতুস্বরূপ ছিল — ।
(ছ) সুঙ্ বংশের তরুণ সম্রাট ছিলেন — ।
(জ) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মঙ্গোলরা — অধীনে শক্তিশালী হয় ।
(ঝ) চেঙ্গিসের পুত্রের নাম ছিল — ।
(ঞ) মঙ্গু খাঁর ভাই-এর নাম ছিল — ।
(ট) কুবলাই নিজেকে — বলে পরিচিত করতেন ।
(ঠ) মার্কো পোলো ছিলেন একজন — পরিব্রাজক ।
(ড) নিনিঙ্গোর পৌত্র ছিলেন — ।
(ঢ) জাপানী সম্রাট ও অভিজাতেরা যে ধর্মে বিশ্বাস করতেন তার নাম — ।
(ণ) জাপানের প্রথম ইতিহাসের নাম — ।
(ত) জাপানের একটি প্রতিপত্তিশালী পরিবারের নাম — পরিবার ।

(থ) বর্বর দমনকারী সেনানায়ককে — বলা হয়।

(দ) সামরিক আইন সংহিতার নাম —।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ অঞ্চলকে কেন দূর-প্রাচ্য বলা হতো?
২। তাঙ্‌দের রাজধানীর নাম কি ছিল?
৩। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর নাম কি ছিল?
৪। চীনের অধিবাসীদের কি ধারণা ছিল?
৫। চীন কতগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল?
৬। চীনের লোকেদের কাছে সম্রাটের প্রতিনিধি কারা ছিলেন?
৭। কাদের 'পাও' বলা হোত?
৮। চীনের পণ্ডিত হিসাবে কিভাবে গণ্য হওয়া যেত?
৯। তু-ফুর কবিতার বিষয়বস্তু কি ছিল?
১০। পো-চুই কি কবিতা লিখেছিলেন?
১১। কোন্ কবি চা পান করতে ভালবাসতেন?
১২। চীনের লোকেদের উপজীবিকা কি ছিল?
১৩। উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীন কি কি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল?
১৪। কোন্ সম্রাটের আমলে বৌদ্ধ পুরোহিতরা নির্যাতিত হয়েছিলেন?
১৫। হিউয়েন-সাঙ্ কার আমলে ভারতে এসেছিলেন?
১৬। হিউয়েন-সাঙ ভারত থেকে কি কি জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন?
১৭। মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া কেন চীনের হাতছাড়া হয়?
১৮। সেন-সুঙের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি ছিল?
১৯। সাঙ্‌-উঙ্‌ গর্ব করে কি বলেছিলেন?
২০। চেঙ্গিস খাঁ কে ছিলেন?
২১। মঙ্গু খাঁ কবে মঙ্গোলদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন?
২২। কুবলাই খাঁ কোথায় তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন?
২৩। হলাগু কে ছিলেন?
২৪। কুবলই খাঁ কি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?
২৫। মার্কো পোলো কে ছিলেন?
২৬। কুবলাই খাঁ মার্কোকে কোন্ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন?
২৭। মার্কো পোলোর সময়ে পিকিং এবং উত্তর চীনের নাম কি ছিল?
২৮। জাপানের কোন্ দিকে বেশি লোকবসতি গড়ে উঠেছিল?
২৯। জাপানের প্রথম ও পরবর্তী জাতীয় ইতিহাসের নাম কি?
৩০। সোগানী আমলে রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত হয়?
৩১। ডোমিও কাদের বলা হোত?

॥ ১১ ॥

ভারতে মধ্যযুগ

পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হলে বলা প্রয়োজন যে, গুপ্তযুগের শেষের দিকে আমরা ভারত ছেড়ে যাত্রা করেছিলাম মধ্যযুগের ইউরোপে। সেখানকার বহু কাহিনী আমরা জেনেছি। এর মধ্যে কোনো সময়ে গিয়েছিলাম কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে, আবার কোনো সময়ে আরব ও মধ্য এশিয়ার নানাস্থানে এবং উত্তর আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে। আবার ঘুরে ফিরে পৌঁছেছিলাম ইউরোপে। তারপরে পৌঁছে গেলাম দূর-প্রাচ্য চীন-জাপানে। এখন আবার ভারতে ফিরে এসেছি। তখন গুপ্তবংশের পতন হয়েছে। হূন্‌ আক্রমণের ফলে ভারতে দারুণ বিপদ চলছিলো।

হূন-আক্রমণ

পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূন-আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে হূনেরা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়লো উত্তর ভারতের সমতল প্রদেশের উপরে। গুপ্ত বংশধরেরা এই সঙ্কটকালে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারলেন না। গুপ্তসম্রাট বুধগুপ্তের মৃত্যুর পরে মালবের পূর্বাংশ এবং শাকল (বর্তমান শিয়ালকোট) হূনদের অধিকৃত হয়।

যাযাবর হূনদের যে শাখা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটালো, তারা 'শ্বেত হূন' নামে পরিচিত। তাদের নেতা ছিলেন তোরমান এবং তাঁর পুত্র মিহিরকুল। পিতা-পুত্রের পরাক্রমে গোয়ালিয়র পর্যন্ত হূনদের অধিকার বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তাঁরা যেমন অত্যাচারী, তেমন ছিলেন রক্তপিপাসু।

ইতিমধ্যে আফগানিস্থান ও পারস্যের এক বিশাল অঞ্চলে হূন আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল।

মিহিরকুল শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করে সম্ভবতঃ ষষ্ঠ

শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হূনদলপতিরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনো প্রকারে টিঁকে থাকতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আর কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। ভারতে হূন-শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে হূনেরা চীন সাম্রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু চীন-সম্রাটের পরাক্রমে চীনদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পূর্ব ইউরোপে বেশ কয়েক বছর ধরে হূনেরা আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাফল্য তারা অর্জন করতে পারেনি। হূনদের মধ্যে অনেকেই ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, ভারতের রাজপুত জাতি হূন, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত।

(ক) গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্তোত্তর যুগ

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সম্রাট কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে 'পুষ্যমিত্র' নামে একটি জাতি বিদ্রোহী হয়। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। হূন আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও প্রায় স্বাধীন হয়েছিলেন। পশ্চিমে বল্লভী, পূর্বে বাংলা, মধ্যভারতে মৌখরী রাজারা গুপ্ত-সম্রাটদের আনুগত্য অস্বীকার করেন। মধ্যভারতে যশোধর্মন হূনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সঙ্কটকালে সাম্রাজ্য রক্ষা করার শক্তি পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের ছিল না। ফলে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়লো।

গুপ্ত-রাজাদের পতনের পর উত্তর ভারতের কয়েকজন রাজা হূনদের বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের

মধ্যে মালবের মান্দাসোরের রাজা যশোধর্মনের নাম উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে যশোধর্মনের কাছে মিহিরকুল পরাজিত হয়ে কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। সমসাময়িক মৌখরীরাজ ঈশানবর্মা হূন আক্রমণ প্রতিরোধ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে পূর্ব পঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বরের পুষ্যভূতি-বংশীয় রাজা প্রভাকর বর্ধন হূনদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্যলাভ করেছিলেন।

॥ কনৌজের পুষ্যভূতি বংশ ॥

প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসার পর তাঁর ভগ্নিপতি কনৌজরাজ গ্রহবর্মা মালবের রাজা দেবগুপ্তের হাতে নিহত হন এবং ভগ্নী রাজ্যশ্রী বন্দী হন। রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করে গ্রহবর্মার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের জন্য পৌঁছবার আগেই নিহত হন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, গৌড় কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কই রাজ্যবর্ধনের হত্যার জন্য দায়ী। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক-দের মতে, রাজ্যবর্ধনের মন্ত্রীরা রাজার গতিপথ সম্বন্ধে ঠিক নির্দেশ দিতে পারেননি। ফলে আততায়ীর হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হয়। শশাঙ্ক ছিলেন মালবের গুপ্তবংশীয় রাজাদের মহাসামন্ত। রাজ্যবর্ধনের বিরুদ্ধে মালব রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

সম্রাট হর্ষবর্ধন

গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর থানেশ্বর ও কনৌজের অধিপতি হন হর্ষবর্ধন। এই দুটি মিলিত রাজ্যের রাজধানীরূপে কনৌজ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। গৌড় কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ককে পরাজিত করতে হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মিত্রতা করেন। কিন্তু শশাঙ্ককে পরাজিত করা সহজ হয়নি। সম্ভবতঃ ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মন

কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন এবং হর্ষবর্ধন "মগধরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন।

॥ উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধন ॥

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো এখনো সম্ভব হয়নি। তবে পূর্ব পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, উড়িষ্যা ও কঙ্গোদ—এ কয়টি দেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন তাঁর অনুগত মিত্র ছিলেন। সিন্ধু, বল্লভী, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তির উপর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারে তিনি সমর্থ হননি। তবে তাঁর প্রধান শত্রু দ্বিতীয় পুলকেশীও তাঁকে



হর্ষবর্ধন ও তাঁর হস্তলিপি

উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট অর্থাৎ 'উত্তরাপথ-নাথ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই উত্তর ভারতে রাজাদের

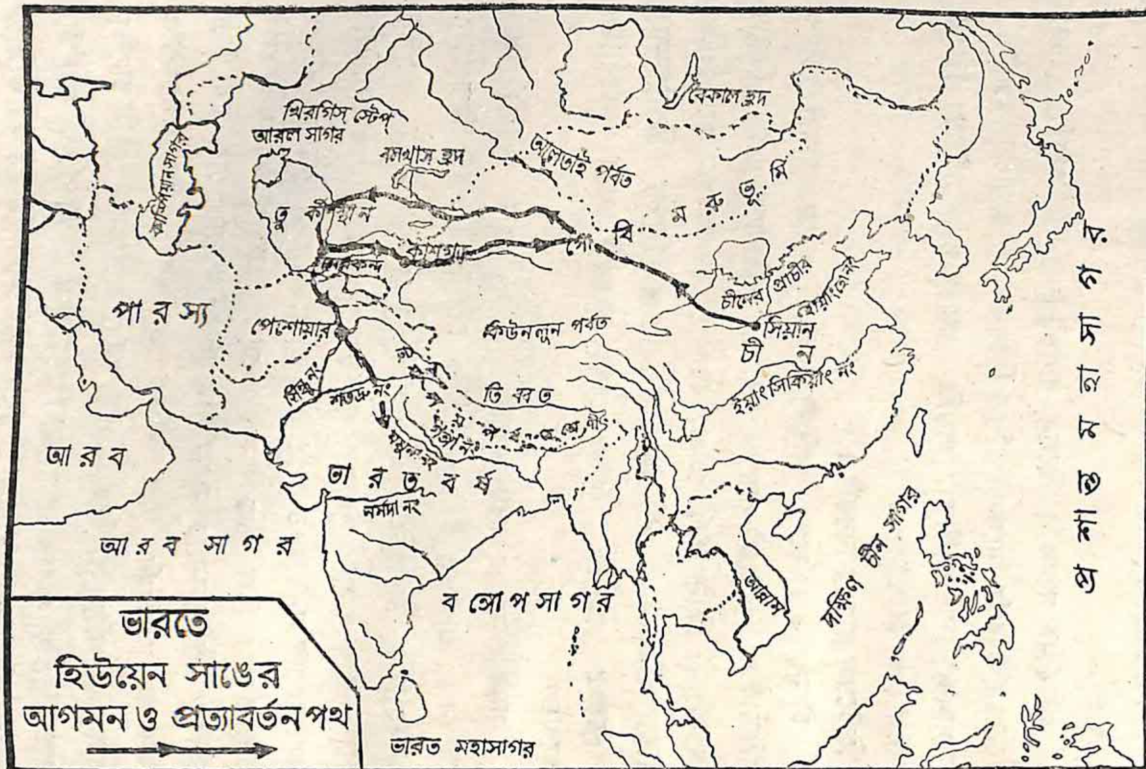
আধিপত্য বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে বিস্তারলাভ আর সম্ভব হয়নি।

হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন বাণভট্ট। তিনি 'হর্ষচরিত' রচনা করেছেন, হর্ষবর্ধন নিজেও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ', 'প্রিয়দর্শিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ হিউয়েন সাঙের বিবরণী ॥

চীনের তাঙ্ যুগের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের ভারত পরিভ্রমণের কথা কিছুটা জেনেছি। তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন রাজ্য পরিদর্শন করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও বেশ কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন।

সমকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি একটি বিবরণী লিখে গেছেন। ভারতের ইতিহাসে এই বিবরণীটি একটি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। এই সময়ে বারাণসী একটি হিন্দু-তীর্থ হলেও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে অনেক বৌদ্ধমঠ স্থাপিত হয়েছিল। মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি স্থান ছিল বৌদ্ধ-শিক্ষার কেন্দ্র। তাম্রলিপ্ত ছিল তখন শ্রেষ্ঠ বন্দর। হিউয়েন-সাঙ্ সমকালীন ভারতীয় রাজগণের মধ্যে উত্তর ভারতের হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় পুলকেশীকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। চীনা বন্ধুর সম্মানার্থে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভার আহ্বান করেছিলেন। প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিকী মেলাতেও হিউয়েন-সাঙ্ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই দুটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়।


ভারতে
হিউয়েন সাঙের
আগমন ও প্রত্যাবর্তনপথ
বৈকাল হ্রদ
আরল সাগর
আলতাই পর্বত
পারস্য
পেশোয়ার
কিউনলুন পর্বত
সিয়ান
চীন
চীনের প্রাচীর
তিব্বত
শতদ্রু নং
আরব
ভারতবর্ষ
নর্মদা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
দক্ষিণ চীন সাগর
ভারত মহাসাগর

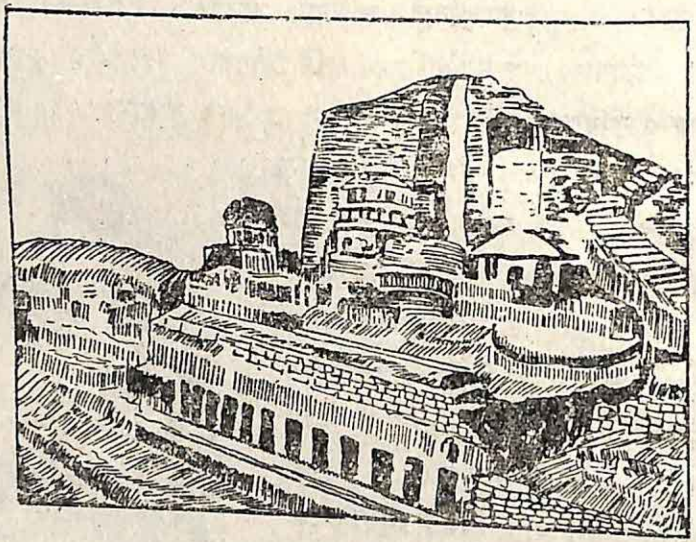
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে তিনি দীর্ঘ আট বছর বসবাস করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা স্বভাবতই নির্ভরযোগ্য। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হতো। দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থায় উদার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজকর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি উপভোগ করতেন। কৃষকদের বীজ ও কৃষিকাজের উপযোগী জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করা হতো। তখন বেগার খাটানো প্রায় বন্ধ হয়েছিল। শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল সরল সহজ। তিনি ভারতীয় জনসাধারণের নানা প্রশংসা করে গেছেন। তবে, পথ-ঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না। হিউয়েন-সাঙ্‌কে একাধিকবার দস্যুর কবলে পড়তে হয়েছিল।


হিউয়েন-সাঙ্‌

॥ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

পূর্ব ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন-সাঙ্‌ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। তখন বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। নালন্দা ছিল একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। হিউয়েন-সাঙের সময়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র একটি পয়সা ব্যয় না করে এখানে অধ্যয়ন করতে

পারতেন। নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গুপ্তোত্তর যুগের স্থাপত্য শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। হিউয়েন সাঙ্ পহ্লব রাজধানী কাঞ্চীর বহু মন্দির এবং



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

মহাবলিপুরমের রথ-মন্দিরসমূহের গঠন পদ্ধতি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

(খ) হর্ষ-পরবর্তী যুগ

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় চলেছিল এক চরম অরাজকতা। হর্ষের রাজধানী কনৌজ বা 'মহোদয়শ্রী' অধিকারের জন্য উত্তর ভারতের ছোট-বড় প্রায় সকল রাজারাই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সম্রাট হর্ষের সম্ভবত কোনো পুত্র-সন্তান ছিল না। বল্লভীর রাজা ধ্রুবভট্টের বিবাহ হয়েছিল হর্ষের এক কন্যার সঙ্গে। চতুর্থ ধারা-সেন ছিলের ধ্রুবভট্টের পুত্র। তিনি নিজেকে হর্ষের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। অন্য দিকে হর্ষবর্ধনের ভগ্নীপতি

কনৌজ-রাজ গ্রহবর্মার এক ভ্রাতা এবং অর্জুন নামে হর্ষের এক মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসনের দাবিদার হয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। পরবর্তী গুপ্তবংশধরদের মধ্যে মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন মধ্য ভারতে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিলেন।

॥ রাজা যশোবর্মন ॥

অবশেষে অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যশোবর্মনের বীরত্বে কনৌজের গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সভাকবি বাক্‌পতির লেখা 'গৌড়বহ' নামক কাব্যগ্রন্থে যশোবর্মনের ইতিহাস কিছুটা জানা যায়। তিনি মগধ, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য অভিযানে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

॥ কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য ॥

কনৌজ-রাজ যশোবর্মন কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সঙ্গে প্রথমে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এই মিত্রতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। যশোবর্মনকে পরাজিত করে ললিতাদিত্য কনৌজ অধিকার করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান ললিতাদিত্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। সম্ভবত ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ললিতাদিত্যের রাজত্বের অবসান হয়। কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ডমন্দির এই যুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে এখনও বর্তমান রয়েছে।

॥ রাজপুত জাতির উত্থান ॥

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বহিরাগত হূন, গুর্জর প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়েছে। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রাজপুত রাজারা পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। রাজপুতেরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের সময়ে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। প্রত্যেক রাজপুত দলপতির অধীনে সমরনিপুণ সৈন্যবাহিনী থাকত। রাজপুত রাজারা নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে নিজেদের দলের

আধিপত্য রক্ষা করতেন। বিবাহ-সম্বন্ধাদি নিয়েও দল-উপদলীয় কোন্দল প্রায় সব সময়ই লেগে থাকত।

রাজপুত রাজাদের মধ্যে পশ্চিম ভারতে গুর্জর-প্রতিহার বংশ, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট বংশ এবং পরবর্তীকালে চৌহান, পরমার, তোমর প্রভৃতি রাজপুত বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজপুত রাজাদের সময়ে আর এক নতুন ধরনের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়। এই সামন্তরা দলীয় আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

॥ উত্তর ভারতে ত্রিশক্তি-সংঘর্ষ ॥

উত্তর ভারতের আধিপত্য বজায় রাখতে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার বংশ, পূর্ব ভারতের পাল বংশ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজ উত্তর ভারতে প্রতিপত্তি বিস্তারে অগ্রসর হলে রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হন। ধ্রুব উত্তর ভারত জয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। বৎসরাজ ও ধ্রুবের সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে পালরাজ ধর্মপাল মগধ, প্রয়াগ ও বারাণসী জয় করে নিলেন। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধর্মপাল ও ধ্রুবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে ধর্মপাল পরাজিত হয়েছিলেন। এই পরাজয়ে ধর্মপালের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয়নি। গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের তাঁবেদার রাজা চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ, দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যবিস্তার প্রতিহত করেছিলেন। উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূট রাজগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িক ভাবে গুর্জর-প্রতিহার রাজাদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছিল।

হর্ষ-পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল। শক্তিলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন রাজশক্তি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কোনো কোনো

রাজবংশ সাময়িকভাবে উত্তর ভারতে প্রতিপত্তি স্থাপন করতে পারলেও এখানে অধিক কাল ধরে কোনো একটি রাজবংশের পক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় রাজারা আরবীয় মুসলমানদের অগ্রগতি প্রতিহত করে অন্ততঃ কয়েকটি শতাব্দীর জন্য ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরাও দুর্বল হয়ে পড়লেন।

পরবর্তী সময়ে উত্তর ভারতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের আধিপত্য কিছুদিন চলেছিল। কিন্তু বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার কথা বলার মত নয়। রাজপুত রাজাদের শাসন-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। কেন্দ্রীয় শাসনে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলেই সামন্ত-শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। এই অবস্থায় কোনো বিশেষ রাজনৈতিক সাফল্য তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

(গ) গৌড় বাংলার অভ্যুদয়

রাজা শশাঙ্ক

পূর্ব ভারতের ইতিহাসে গৌড়দেশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। গৌড়ের প্রাধান্যের মূলে ছিল রাজা শশাঙ্কের নেতৃত্ব। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত রাজা। পরে নিজের চেষ্টায় সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে স্থাপন করলেন গৌড়ের প্রাধান্য। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হর্ষবর্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে হর্ষবর্ধনের পক্ষে মগধ ও বঙ্গভূমি জয় করা সম্ভব হয়নি।

তিনি ধর্মমতে শৈব ছিলেন। কিন্তু পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক সমগ্র বাংলা ও উড়িষ্যার এক বৃহৎ অংশ নিয়ে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এটি একটি গৌরবময় অধ্যায়।

॥ পাল ও সেন যুগের বাংলা ॥

রাজা শশাঙ্ক গৌড় বাংলার অভ্যুত্থানের যে সূচনা করেছিলেন পরবর্তী পাল ও সেনবংশের আমলে এই গৌরব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়, প্রায় সাড়ে চারশ বছর ধরে এ দু'টি রাজবংশ পূর্ব ভারতে রাজত্ব করেছিল। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। তাঁর পরবর্তী বংশধর ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে পাল-সাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। মাঝে মাঝে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পাল সম্রাটেরা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত গৌড়-বাংলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। পরবর্তী সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন। এই বংশের বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালও বেশ প্রসিদ্ধ।

পাল ও সেন রাজাদের শাসনাধীনে বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ সামাজিক অবস্থা ॥

পাল ও সেন যুগের সাহিত্য গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, এ যুগের বাঙালী জাতি অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল জীবন যাপন করত। পালযুগের কবি **সন্ধ্যাকরনন্দী** রচিত **'রামচরিতে'** দেখা যায় যে, এযুগের সমাজজীবন উন্নত ছিল।

সেন বংশীয় রাজা বল্লালসেনের আমলে বাঙালী হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্য-শিল্পে সমসাময়িক জনসাধারণের জীবনযাত্রার নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। পোশাক-পরিচ্ছদে বিশেষ কোনো আড়ম্বর ছিল না। পুরুষেরা ধুতি ও চাদর পরতো। আর নারীরা পরতেন শাড়ি। ওড়নার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অলংকার ব্যবহারের

রীতি ছিল। সোনা ও রূপার কুণ্ডল, কেয়ূর, বালা, আংটি, হার, নাকফুল, মল প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহৃত হত। তবে মেয়েরাই বেশি অলঙ্কার পরতেন। খাদ্যের মধ্যে ঘি, ভাত, শাক, সব্জি, মাছ, মাংস এবং দুগ্ধজাত পিঠে-পায়স ছিল সেকালের বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। দুর্গাপূজা ছিল এখনকার মত তখনকার বাঙালীদেরও প্রধান উৎসব। সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে নাচ, গান ও বিভিন্ন বাদ্য-ভাণ্ডের ব্যবস্থা করা হত। বারো মাসে তের পার্বণ তখনও ছিল। পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলায় তারা অবসর-বিনোদন করত। নানারকম খেলাধুলো, মল্লযুদ্ধ করে আনন্দ পেত।

॥ ধর্ম ॥

গুপ্ত সম্রাটদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। এই সময় বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক মতবাদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্মের দ্বারা এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত হয়েছিল। তবে পাল রাজারা ধর্মমতে সহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। অনেক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ পাল রাজাদের মন্ত্রী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁদের সময়ে যাগযজ্ঞের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই সময় শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

॥ শিক্ষা-দীক্ষা ॥

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ওদন্তপুরী বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। এই বিহারে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল।

বিক্রমশীলা মহাবিহার স্থাপিত হয় ধর্মপালের রাজত্বকালে। তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু শিক্ষার্থী বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এখানে আসতেন। বিক্রমশীলা মহাবিহারের কোনও ধ্বংসাবশেষ এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে সম্ভবতঃ ভাগলপুরের নিকটবর্তী

রাজমহল গিরিশ্রেণীর পাথরঘাটা অঞ্চলে এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। রত্নাকর শান্তি, নারোপা, অতীশ-দীপঙ্কর প্রভৃতি অধ্যাপক তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্মের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

পালযুগের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন অতীশ-দীপঙ্কর। তাঁর আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। পিতা কল্যাণশ্রী ও মাতা প্রভাবতীর পুত্র দীপঙ্করের বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। বৌদ্ধ সঙ্ঘে দীক্ষা লাভের পরে নামকরণ হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যাপনা করতেন। তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে দীপঙ্কর সম্ভবতঃ ১০৪১ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতে যাত্রা করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, অতীশ তিব্বতে অবস্থান কালে প্রায় দুইশতখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার অধিকাংশই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর রচিত।



অতীশ-দীপঙ্কর

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে পালরাজাদের অন্যতম কীর্তি সোমপুরী মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজা রামপালের রাজধানী রমাবতীর নিকট জগদ্দল মহাবিহারটি অবস্থিত ছিল। এই বিহারগুলির প্রত্যেকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান-রূপে পরিগণিত হতো। মুসলমান আক্রমণে প্রায় সব ক'টি বিহারই ধ্বংস হয়।

॥ **বৌদ্ধ-চর্যাপদ** ॥

পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ-চর্যাপদ রচিত হয়। এগুলি বাংলা ভাষায় আদি রচনা। বৈষ্ণব-পদাবলী, শাক্ত-পদাবলী প্রভৃতিতে চর্যাপদসমূহের প্রভাব সুস্পষ্ট।

॥ **সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা** ॥

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে পাল ও সেনযুগ এক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। কবি **সন্ধ্যাকরনন্দী** পালবংশীয় রাজা রামপালের সভাকবি ছিলেন। তিনি বিখ্যাত 'রামচরিত' কাব্য রচনা করেন।

চক্রপাণি আয়ুর্বেদাচার্য **চরক ও সুশ্রুতের** তুখানি গ্রন্থের উপর তু'খানি টীকা রচনা করেন।

সেনরাজ বল্লালসেন নিজে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'আচার্যসাগর', দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেনও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্গণের মধ্যে **উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব, শরণ, ধোয়ী** প্রভৃতি পণ্ডিতদের নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ **স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প** ॥

পালযুগে নির্মিত সোমপুরী মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড়পুরের মন্দিরের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি সেকালের মানুষদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই মন্দির-গাত্রে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক কাহিনী পোড়ামাটির ফলকে খোদিত রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, তারা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি যেমন রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে দৈত্যদানব-নাগ-কিন্নর-গন্ধর্ব প্রভৃতির বিভিন্ন মূর্তি প্রস্তরে ও পোড়ামাটির ফলকে অতি নিপুণভাবে নির্মিত হয়েছে। ক্রীড়ারত মল্লবীর, কলসীকাঁখে পল্লীরমণী, লাঙ্গলকাঁধে কৃষক,

নৃত্যরতা নারী—সেকালের বাঙালীর এমন বহু চিত্র পাওয়া গিয়েছে।

পালযুগের **ধীমান** ও তাঁর পুত্র **বীতপাল** এবং সেনযুগের শিল্পী **স্নাণক শূলপাণি** এই অভিনব শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন।

(ঘ) *দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্য*

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও এক সুপ্রাচীন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর ভারতের আর্য-সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রণে এই সভ্যতা যেন আরও ঐশ্বর্যশালী হয়েছিল। উত্তর ভারতে যখন বিদেশী আক্রমণের তাণ্ডব চলছিল, তখন দক্ষিণ ভারতের রাজারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিলেন।

চালুক্য রাজবংশ

বাতাপীর চালুক্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম পুলকেশী। তার পৌত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়েই গুজরাট, মালব, কোঙ্কন, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে চালুক্যদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদূর দক্ষিণ ভারতের চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যও চালুক্যদের অধীনতা স্বীকার করেছিল। দ্বিতীয় পুলকেশী নর্মদা হতে কাবেরী নদী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁকে বলা হত **'দক্ষিণ-পথনাথ'**।

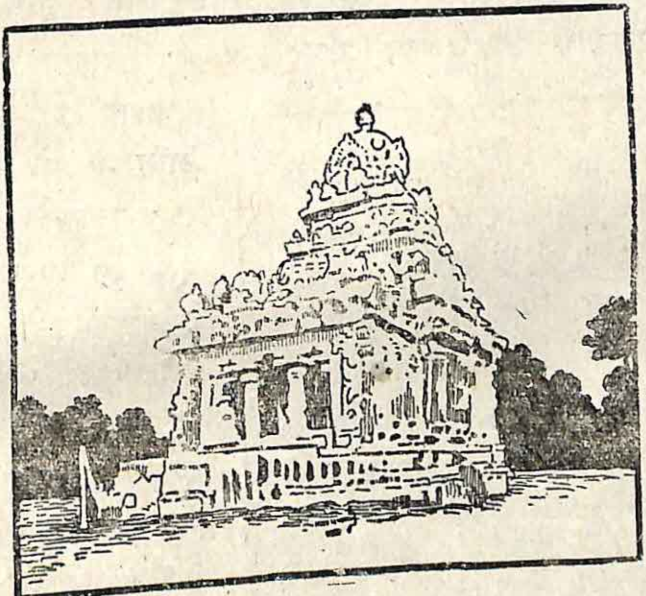
তাঁর সমসাময়িক ছিলেন কনৌজের সম্রাট হর্ষবর্ধন। চালুক্য-রাজের পরাক্রমে হর্ষবর্ধন বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণদিকে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হননি। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ চালুক্যরাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বের শেষভাগে চালুক্যদের প্রতিবেশী পল্লবেরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী অধিকার করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য চালুক্যদের লুপ্ত গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধারে

সমর্থ হয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূটদের নিকট পরাজিত হওয়ায় চালুক্য রাজত্বের অবসান ঘটে।

পল্লব রাজবংশ

পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। এই বংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক।

এই বংশের রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল থেকে চালুক্য-পল্লব সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করার গৌরব অর্জন করেছিলেন প্রথম নরসিংহবর্মন। তিনি মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র। অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য রাজারা পুনরায় পল্লব প্রভুত্বের উচ্ছেদ করেন। এই



মহাবলিপুরমের রথ

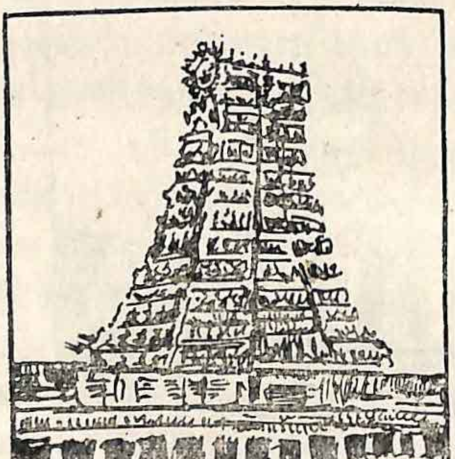
সময়ে দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ পল্লবরাজ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি এখানে বহু বৌদ্ধ মঠ, হিন্দু এবং জৈন মন্দির দেখেছিলেন। পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন ভাস্কর্য-

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে মহাবলিপুরমে পাথর খোদাই করে 'সপ্তরথ' মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির তাঁর সময়ে স্থাপত্যশিল্পের আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

বড় বড় পাহাড় কেটে পল্লব রাজাদের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। সেগুলির নির্মাণকৌশল, অনুপাত-জ্ঞান ও কারুকার্য আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

চোল রাজবংশ

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ বছর কাল সুদূর দক্ষিণে ভারতের চোলরাজারা বেশ শক্তিশালী ছিলেন। পল্লবদের পরাজিত করে তাঞ্জোরের চোল রাজারা দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হন। বিখ্যাত চোলরাজ রাজরাজ চের ও পাণ্ড্য-রাজ্য অধিকার করেন। চোলরাজাদের প্রভুত্বের মূলে ছিল তাঁদের প্রবল নৌশক্তি। রাজরাজের নৌবাহিনীর পরাক্রমে সিংহলের কিছু অংশ চোল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। উত্তরে কলিঙ্গ থেকে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত চোলরাজদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।



মুক্তেশ্বর মন্দির (গোপুরমের নমুনা)

প্রথম রাজেন্দ্রচোল এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। সমুদ্রপথে অগ্রসর হয়ে বাংলার পালরাজ্য আক্রমণ করে এই বংশের রাজা প্রথম মহীপালকে তিনি পরাজিত করেন। গাঙ্গেয়ভূমি জয় করে তিনি

'গঙ্গাই কোণ্ড' বা গঙ্গাতীর-বিজয়ী উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি "গঙ্গোইকুণ্ড-চোলপুরম্" নামে এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজেন্দ্রচোলের নৌ-সেনাপতিরা সিংহল, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এমনকি মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন। চোলদের সঙ্গে যুদ্ধে সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা পরাজিত হন এবং চোলরাজ শ্রীবিজয়ের রাজধানী দখল করেন। পরে সন্ধির ফলে শ্রীবিজয়ের রাজবংশকে সমুদ্রপথে চোলরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

চোলরাজারা দেবমন্দির নির্মাণে পল্লবদের শিল্প-রীতি গ্রহণ করে তার সমৃদ্ধিসাধন করেছিলেন। তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিবমন্দির ও গঙ্গাইকোণ্ড-চোলপুরমের মন্দিরগুলি চোল স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। প্রত্যেকটি মন্দিরের প্রবেশপথে এক একটি "গোপুরম্" নির্মিত হয়েছে। কুম্ভকোনমের বিরাট গোপুরম্ সম্বলিত মন্দিরটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। হূন কারা? ভারতে হূন আক্রমণ বর্ণনা কর।

২। হর্ষবর্ধন কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৩। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি জান?

৪। পাল ও সেন যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৫। পাল রাজারা শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কিরূপ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন?

৬। পল্লব ও চোল রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ গুপ্ত সম্রাট হূন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

২। শ্বেত হূন কারা? তাদের দুইজন নেতার নাম কর।

৩। হূনেরা চীন আক্রমণ করে কি সফল হয়েছিল?

৪। হর্ষবর্ধন কিভাবে থানেশ্বর ও কনৌজের অধিপতি হন ?

৫। হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল ?

৬। হর্ষের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

৭। হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব বিস্তারে কেন সমর্থ হননি ?

৮। হিউয়েন-সাঙের মতে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন ?

৯। হর্ষবর্ধনের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে হিউয়েন-সাঙ্ কি লিখেছিলেন ?

১০। বাকপতির লেখা গ্রন্থের নাম কি ? এতে কি লেখা আছে ?

১১। রাজপুত জাতির কিভাবে উৎপত্তি হয়েছিল ?

১২। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজপুত বংশের নাম কর।

১৩। উত্তর ভারতে তিনটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির নাম লেখ।

১৪। শশাঙ্ক কে ছিলেন ?

১৫। বাংলার ইতিহাসে কার রাজত্বকে একটি গৌরবময় অধ্যায় বলা হয় ?

১৬। পাল রাজাদেয় ধর্ম সম্বন্ধে কি জান ?

১৭। পালযুগে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ?

১৮। অতীশ-দীপঙ্কর সম্বন্ধে কি জান ?

১৯। সন্ধ্যাকরনন্দী কে ছিলেন ? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন ?

২০। পালযুগের ও সেনযুগের কয়েকটি শিল্পীর নাম কর।

২১। 'দক্ষিণপথনাথ' কাকে বলা হতো এবং কেন ?

২২। পল্লব রাজাদের রাজধানীর নাম কি ছিল ?

২৩। চোল বংশের একজন বিখ্যাত রাজার নাম কর।

২৪। 'গঙ্গৈাই কোণ্ড' উপাধি কে নিয়েছিলেন ? তিনি কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ?

২৫। গোপুরম্ কি ? ইহা কোথায় দেখতে পাওয়া যায় ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। যে উত্তরটি ঠিক তার পাশে √ চিহ্ন দাও :—

(ক) হর্ষবর্ধনের সময় কামরূপের রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মা/শশাঙ্ক/দেবপাল

(খ) হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলের উমাপতি ধর/ধোয়ি/বাণভট্ট

(গ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন দেবপাল/শীলভদ্র/ধীমান

(ঘ) বাকপতির লেখা গ্রন্থের নাম গৌড়বাহ/রাজতরঙ্গিণী/কিতাব-উল-হিন্দ।

(ঙ) রামচরিতের লেখক ছিলেন বীতপাল/সন্ধ্যাকরনন্দী/বাকপতি

(চ) পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবপাল/গোপাল/বীতপাল

(ছ) বৌদ্ধ চর্যাপদ রচিত হয় পাল-রাজাদের আমলে / সেন রাজাদের আমলে / গুপ্ত রাজাদের আমলে

২। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ**

১। হর্ষবর্ধন—, — —, — গ্রন্থ রচনা করেন।
২। পঞ্চবার্ষিকী মেলা — অনুষ্ঠিত হতো।
৩। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল —।
৪। বৈষ্ণব কবি — লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।
৫। বিক্রমশীলা মহাবিহার স্থাপিত হয় — রাজত্বকালে।
৬। অতীশ-দীপঙ্করের পিতার নাম ছিল — ও মাতার নাম ছিল —।
৭। রাজা রামপালের রাজধানী ছিল —।
৮। চরক ও সুশ্রুতের উপর দুখানি টীকা রচনা করেন —।
৯। বল্লাল সেন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন — ও —।
১০। চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —।
১১। চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন —।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ গুপ্ত সম্রাট হূন আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ?
২। শ্বেত হূন কারা ?
৩। মিহিরকূল কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন ?
৪। কুমারগুপ্তের রাজত্বে কারা বিদ্রোহী হয় ?
৫। হর্ষবর্ধনের অনুগত মিত্র কে ছিলেন ?
৬। হর্ষবর্ধন কি কি গ্রন্থ রচনা করেন ?
৭। হিউয়েন-সাঙ্ কত বৎসর ভারতে অবস্থান করেছিলেন ?
৮। তখনকার শ্রেষ্ঠ বন্দরের নাম কি ছিল ?
৯। পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কি ছিল ?
১০। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র অধ্যয়ন করত ?
১১। যশোবর্মনের ইতিহাস কোন্ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ?
১২। শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ?
১৩। কাদের আমলে পালসাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে ?
১৪। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
১৫। সেন রাজারা কোন্ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ?
১৬। কোন্ বৈষ্ণব কবি লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলংকৃত করেন ?
১৭। পালযুগের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ?
১৮। দীপঙ্করের বাল্যনাম কি ছিল ?
১৯। বল্লাল সেন কি কি গ্রন্থ রচনা করেন ?
২০। সপ্তরথ কোথায় নির্মিত হয়েছিল ?

ভারতের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতি

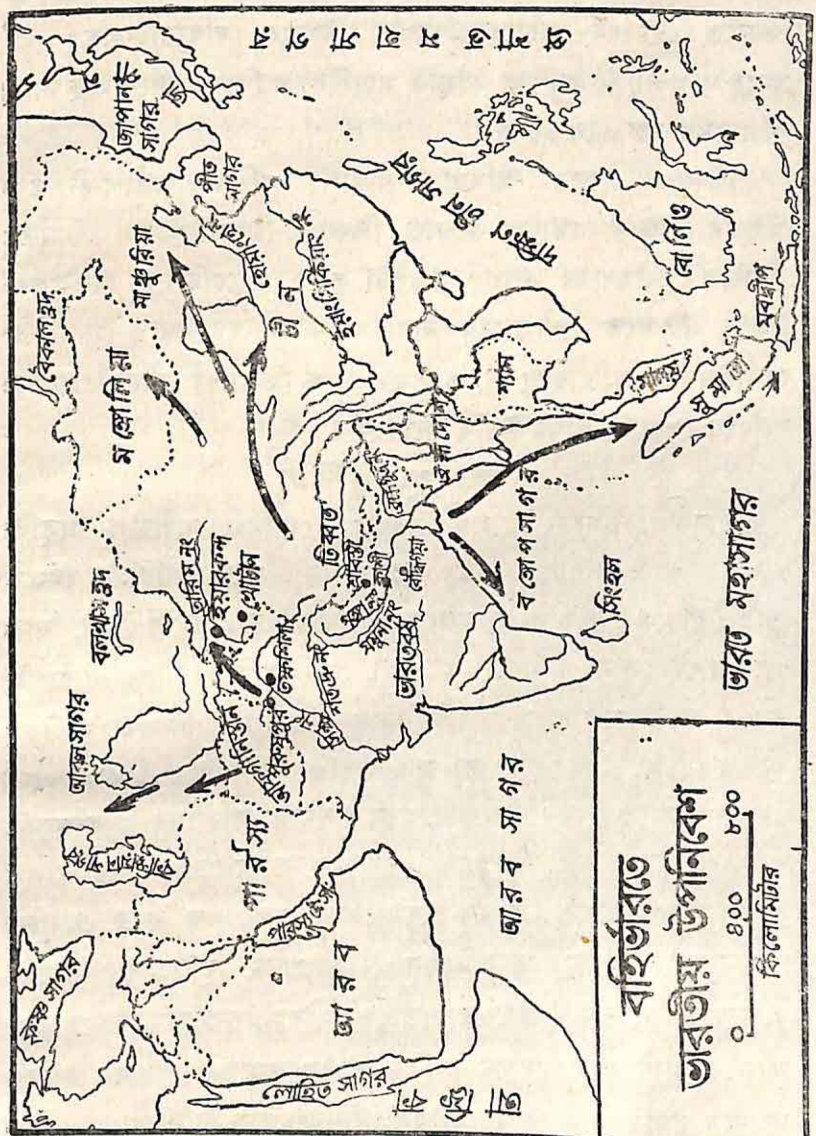
সম্রাট অশোকের কয়েকখানি শিলালিপি পাঠ করে জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক ধর্ম-প্রচারক ভারতের বাইরে পাঠিয়েছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক গ্রীক লেখক তাঁর 'পেরিপ্লাস'-নামক গ্রন্থে ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের বাণিজ্য-সম্পর্কের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ-রাজ কণিষ্কের সময় থেকে বিদেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে বিপুল উদ্যম দেখা দিয়েছিল।

মধ্য এশিয়া

কুষাণ আমলে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধপ্রচারকদের অপরিসীম উদ্যমে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে সুদূর চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাসগর, সমরকন্দ, কুচি, তুরফান প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্মের নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টাইন এ সব অঞ্চল খনন করে বহু বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ, বহু বৌদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এবং এমনকি প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছেন। অরেল স্টাইন বলেছেন, খোটান অঞ্চলে ভ্রমণ করার সময়ে তাঁর মনে হয়েছে যে, তিনি যেন ভারতের কোন অঞ্চলে ভ্রমণ করছেন। আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মধ্য এশিয়ার এক বিশাল অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

মধ্য এশিয়ার স্থলপথ ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেরা দূর-প্রাচ্যে গমন করেছিলেন। চীন, কোরিয়া, জাপান থেকেও বহু

জ্ঞান-পিপাসু ভারতে এসেছিলেন। পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।



আরবীয় খলিফাদের আমলে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত-শাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি ইসলামী সাম্রাজ্যে সমাদৃত হয়েছিল।

তিব্বতের রাজা স্রং-শান গাম্পো ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাল রাজারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এ সময়ে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিহারে তিব্বত থেকে বহু ছাত্র অধ্যয়নের জন্য এসেছিলেন।

তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে বাঙালী পণ্ডিত অতীশ-দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিব্বতে গিয়েছিলেন। এসময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। অতীশের উদ্যমে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নতুন প্রাণের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, এ সময় থেকে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, মালয়, যবদ্বীপ, বোর্নিও, বলিদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল ভারতবাসীর কাছে 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত ছিল। ভারতীয়রা এ দেশগুলিকে বলতো সুবর্ণভূমি বা সোনার দেশ, যার পথে-ঘাটে সোনা ছড়ানো থাকতো, যেন কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়। দুরতিক্রম্য সাগর পাড়ি দিয়ে সেখানে বণিকেরা বাণিজ্য করতে যেতো, ফিরে আসতো জাহাজভর্তি সোনা নিয়ে অর্থাৎ প্রচুর ধন-সম্পদ্ লাভ করে। আবার অনেক সময়ে তাহাদের জাহাজডুবি হয়ে একেবারে ভরাডুবি হতো। অনেক ভাগ্যান্বেষী ক্ষত্রিয় রাজা, রাজপুত্র সুবর্ণভূমিতে বাহুবলে কোন কোন রাজ্য জয় করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ধর্মপ্রচার, রাজকার্য, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি কাজেও ভারতবাসীরা সুবর্ণভূমিতে যেতেন, অনেকে স্থায়ীভাবে সেখানে বসতিও স্থাপন করতেন। এসব কারণে মধ্যযুগে সুবর্ণভূমিতে বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

সম্রাট অশোকের আমলে প্রথমে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশে, পরে উত্তর ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। এখান থেকে শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্মের

প্রসার ঘটে। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলজাতীয় থেইগণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

কম্বোজরাজ্য

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ইন্দোচীনের কম্বোজ বা কম্বোডিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। প্রবাদ আছে যে, কৌণ্ডিন্য নামে জনৈক ক্ষত্রিয় রাজকুমার এখানে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চীনারা কম্বোজরাজ্যকে 'ফুনান' নাম দিয়েছিল। ফুনান একসময়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি জয় করেছিল। এক সময়ে ফুনানের গৌরব স্তব্ধ হয়ে গেল। ফুনানের পতন হলো।

নবম শতাব্দী থেকে রাজা যশোবর্মনের রাজত্বকালে কম্বোজ রাজ্যের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তিনি কম্বুপুরীতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। পরে রাজার নামানুসারে রাজধানীর নাম হয় যশোধরপুর।


বেয়নের মন্দির

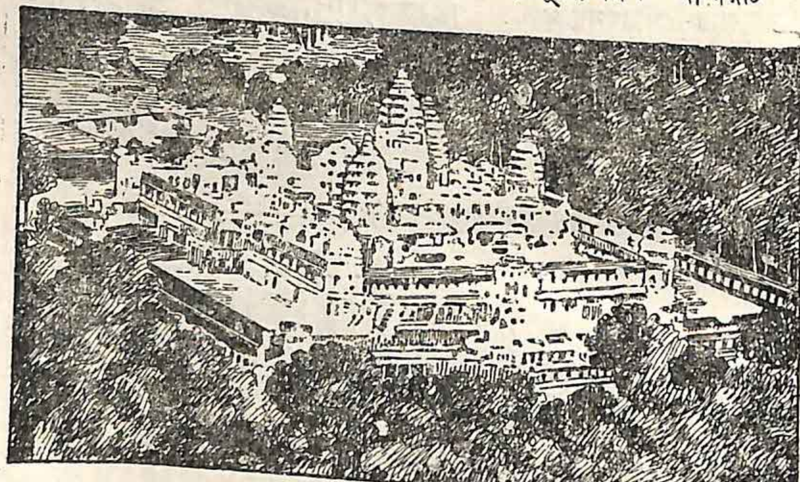
দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সপ্তম জয়বর্মন প্রাচীন রাজধানী যাশাধরপুরের সংস্কার করে 'আঙ্কোরথম্' নামে একটি নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

রাজা সপ্তম জয়বর্মন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজধানীতে প্রায়

শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

রাজা সপ্তম জয়বর্মনের আর একটি অক্ষয় কীর্তি হলো বিখ্যাত 'বেয়ন-মন্দির'। আঙ্কোরথম নগরটির কেন্দ্রস্থলে পিরামিডের আকারে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির চল্লিশটি গম্বুজের প্রত্যেকটির চূড়া ধ্যানরত শিবমূর্তির আকারে নির্মিত হয়েছিল। বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায়ের দেবতা অবলোকিতেশ্বরের নামে মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই মন্দিরটি ভারতীয় ভাস্কর্যের এক উন্নত নিদর্শন।

পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির **আঙ্কোরভাট** নির্মাণ করেন রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মন। 'আঙ্কোরভাট' একটি বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরটি



আঙ্কোরভাট মন্দির

প্রায় দুশো ফিট উঁচু। তার পরিধিও ছিল বিশাল। রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁর দেহভস্ম এই মন্দিরেই রক্ষিত হয়েছিল।

চম্পারাজ্য

কম্বোজ রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রাচীন চম্পারাজ্য অবস্থিত ছিল। মনসাপুরাণের চাঁদ সদাগরের রাজধানীর নাম ছিল চম্পা বা

চম্পক। মনে হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই উপনিবেশটি বাঙালীরাই গড়ে তুলেছিলেন।

চম্পারাজ্য ছিল চীন সাম্রাজ্যের সংলগ্ন। এখানকার হিন্দু-রাজাদের সঙ্গে চীন-সম্রাটদের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো। পার্শ্ববর্তী কম্বোজরাজ্যের সঙ্গেও চম্পারাজাদের রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। কম্বোজরাজ সপ্তম জয়বর্মন চম্পারাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চীনের মঙ্গোল নায়ক কুবলাই খান্ চম্পারাজ্য বিধ্বস্ত করেন। চম্পারাজ্যের সভ্যতার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করার মত। শিব, শক্তি, গণেশ, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা এখানে প্রচলিত ছিল। অনেক শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

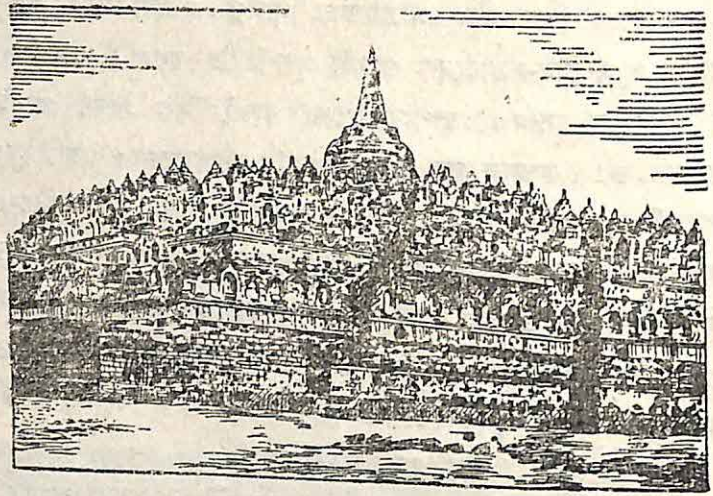
শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দ্বীপগুলির উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল শ্রীবিজয়। ইতিহাসে এই সাম্রাজ্য শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত হয়েছে।

সম্ভবতঃ শৈলেন্দ্র রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল কলিঙ্গ। নবম শতাব্দীতে সুলেমান নামে এক আরব বণিকের বর্ণনায় জানা যায়, কোনও এক শৈলেন্দ্র রাজা যশোধরপুর অধিকার করেছিলেন। আরব বণিকেরা শৈলেন্দ্র রাজাদের ঐশ্বর্য-সম্পদের অনেক বর্ণনা করে গিয়েছেন।

শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব বাংলার পালরাজা দেবপালের সাথে মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বালপুত্রদেব ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। গৌড়দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। রাজারা বৌদ্ধ মহাযান মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য জাভায় অবস্থিত 'বরোবুদুরের' সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরটি

শৈলেন্দ্র রাজাদের অক্ষয় কীর্তি। ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্করেরা এই মন্দিরটি নির্মাণ করে সাজিয়েছিলেন।



বরোবুদুরের মন্দির

একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজাদের বিশাল নৌবাহিনীর আক্রমণে শৈলেন্দ্র রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ভারত মহাসাগরের বহু দ্বীপ-উপদ্বীপ চোল রাজাদের অধিকারে যায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে এই রাজ্যের পতন হয়।

॥ বৃহত্তর ভারত ॥

এক সময়ে কাস্পিয়ান সাগর থেকে আরম্ভ করে বলিদ্বীপ পর্যন্ত এবং সিংহল থেকে জাপান পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের একটি সুবিশাল ভূভাগে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পরীতির অসামান্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এখনও আচার-ব্যবহারে, সামাজিক রীতিনীতিতে ভারতীয়দের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বলিদ্বীপের অধিবাসীরা নাচে-গানে-অভিনয়ে এখনও ভারতের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্বন্ধে কি জান?

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। বৌদ্ধ প্রচারকদের উদ্যমে কোথায় কোথায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে?

২। তিব্বতে কে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন?

৩। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক তিব্বতের রাজা কে ছিলেন?

৪। সুবর্ণভূমি কার নাম ছিল? কেন এই নাম দেওয়া হয়েছিল?

৫। চীনারা কাকে ফুনান বলত?

৬। বেয়ন মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন? মন্দিরটির বর্ণনা কর।

৭। আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন? ইহা ভারতীয় ভাস্কর্যের উন্নত নিদর্শন কেন?

৮। চম্পারাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? এই রাজ্যের বর্ণনা দাও।

৯। বরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১০। এশিয়া মহাদেশের কতখানি জায়গায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল?

১১। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে জনৈক গ্রীক লেখকের গ্রন্থের নাম কি ছিল?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলজাতির — বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

(খ) আঙ্কোরভাট একটি —।

(গ) দ্বাদশ শতাব্দীতে সপ্তম জয়বর্মন — নামে এক নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঘ) চাঁদসদাগরের রাজধানীর নাম ছিল —।

(ঙ) শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন —।

(চ) মধ্য জাভায় অবস্থিত — মন্দিরটি শৈলেন্দ্র রাজাদের অক্ষয় কীর্তি।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের নাম কর।

২। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক তিব্বতের রাজার নাম কর।

৩। কোন্ অঞ্চলকে সুবর্ণভূমি বলা হয়?

৪। অশোকের আমলে দেশের বাইরে কোথায় কোথায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়?

৫। চীনারা কম্বোজরাজ্যকে কি নাম দিয়েছিল?

৬। যশোধরপুর নাম কেন হয়?

৭। রাজা সপ্তম জয়বর্মন কোথায় নগরীর পত্তন করেন?

৮। সপ্তম জয়বর্মনের একটি অক্ষয় কীর্তির নাম কর।

৯। আঙ্কোরভাটের মন্দির কে নির্মাণ করেন?

১০। চাঁদসদাগরের রাজধানীর নাম কি ছিল?

১১। চম্পারাজ্যে কোন্ কোন্ দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল?

১২। কে শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন?

১৩। শৈলেন্দ্র রাজাদের অক্ষয় কীর্তি কি ছিল?

॥ ১৩ ॥

দিল্লীতে সুলতানি শাসন

উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধুদেশে ইসলামের রণ-ভেরি এক সময়ে বেজে উঠলো। মহম্মদ-বিন্-কাশিমের নেতৃত্বে মুসলমান বাহিনী ৭১২ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু ও সিন্ধু-উপত্যকার বেশ কিছু অঞ্চল অধিকার করে নিল। আরবীয় মুসলমানদের প্রভুত্ব অতি ক্ষুদ্র অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারতে আরব প্রভুত্বের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না।

তুর্কীশক্তির অভ্যুদয়

মধ্য এশিয়ার একটি বিরাট অংশকে তুর্কীস্থান বলা হয়। বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তরে কাজাকিস্থান থেকে দক্ষিণে তিব্বত, আফগানিস্থান ও পারস্যের সীমানা পর্যন্ত এবং পূর্বে গোবি মরুভূমি থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডকে তুর্কীস্থান বলা হয়। খলিফাদের পতনের পরে এক দুর্ধর্ষ শক্তি হিসাবে তুর্কী-মুসলমানদের অভ্যুদয় হয়েছিল।

ভারতে তুর্কী-আফগান প্রভুত্বের সূচনা

তুর্কী মুসলমানেরাই ভারতে ইসলামী প্রভুত্বের সূচনা করেছিল। নবম শতাব্দীর শেষভাগে গজনীতে একটি স্বাধীন তুর্কী রাজ্যের সৃষ্টি হয়। গজনীর সুলতান মামুদ সতেরবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। পঞ্জাব অঞ্চলের শাহীরাজা জয়পাল মামুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অসমর্থ হলেন। তাঁর পুত্র আনন্দপাল উত্তর ভারতের রাজপুত রাজাদের সম্মিলিত করে মামুদকে বাধা দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

ঘুর রাজ্য

ঘুর রাজ্য অবস্থিত ছিল গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পর্বত-সঙ্কুল আফগানিস্থানে, তাই ঘুর বংশীয় সুলতানদের তুর্কী-আফগান বলা হয়। মামুদের মৃত্যুর পরে তাঁর বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে ঘুর বংশীয় গিয়াস্‌উদ্দীদ গজনী অধিকার করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা মুইজউদ্দিন মহম্মদ-বিন্‌-সামকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনিই ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে প্রসিদ্ধ।

১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লীর চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীর হাতে পরাজিত হলেন। যুদ্ধটি ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। হিন্দু-শক্তি বিপর্যস্ত হওয়ার ফলেই দিল্লীতে তুর্কী-আফগান সুলতানি আমলের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভারত-বিজয়ে মুসলমানদের লক্ষ্য

আক্রমণকারী মুসলমান শক্তির ভারত-বিজয়ের লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করা। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মকে চরম আঘাতে দুর্বল করে দিয়ে হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ইচ্ছাই ছিল আক্রমণকারীদের প্রধান লক্ষ্য। হিন্দু-মন্দিরসমূহ লুণ্ঠন করে প্রচুর ধন-রত্ন আত্মসাৎ করার কামনাও তাদের দুর্বার ছিল। ভারতীয় ভূ-খণ্ডের উর্বর জনপদসমূহ অধিকার করে সেখানকার প্রচুর ধন-সম্পদ্‌ লাভের উদগ্র লালসা মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল।

উত্তর ভারতে তখন দুটি প্রধান রাজপুতবংশ রাজত্ব করছিল। একটি চৌহান আর একটি গহড়ওয়াল। চৌহান পৃথ্বীরাজের সঙ্গে গহড়ওয়াল জয়চাঁদের ঘোর শত্রুতা চলছিলো। এই অবস্থায় মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারত জয় করলো এবং প্রায় তিনশো বছর ধরে দিল্লীতে তুর্কী-আফগানী সুলতানেরা এক স্বৈরতন্ত্রীয় শাসনের প্রবর্তন করলেন।

তুর্কী সুলতানি আমলে রাজনৈতিক অবস্থা

১২০৬ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুদেশে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হয়। তাঁর কোনো পুত্র ছিল না। তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম কুত্‌বউদ্দীন আইবক হলেন দিল্লীর প্রথম স্থলতান।

কুত্‌বউদ্দীন আইবক (১২০৬-১০)

কুত্‌বউদ্দীন ও তাঁর পরবর্তী স্থলতানদের মধ্যে সকলেই পূর্বজীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে এই বংশকে 'দাস-রাজবংশ' বলা হয়।

দিল্লীতে মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করার পর একদিন লাহোরে পোলো খেলবার সময় সহসা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে স্থলতানের মৃত্যু হয়। তিনি দিল্লীর কুত্‌ব-মিনার ও কুত্‌ব-মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ইল্‌তুৎমিস্‌ (১২১০-৩৬)

কুত্‌বউদ্দীনের অপদার্থ পুত্র আরামশাহ্‌কে সিংহাসন থেকে অপসারিত করে কুত্‌বউদ্দীনের ক্রীতদাস ও জামাতা ইল্‌তুৎমিস্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গজনীর তাজউদ্দীন ইলদিজ, সিন্ধু ও বাংলার নাসিরুদ্দীন কুবাচ ও আলীমরদান্‌ প্রভৃতি বিদ্রোহীরা ইল্‌তুৎমিসের হাতে পরাজিত হলেন। ইল্‌তুৎমিস্‌ গোয়ালিয়র ও রন্‌থম্ভোর দুর্গ অধিকার করলেন এবং উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করলেন।

১২২৯ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা ইল্‌তুৎমিস্‌কে 'স্থলতান-ই-আজম্‌' উপাধিতে ভূষিত এবং ভারতের অধিপতি বলে স্বীকার করেন।

ইল্‌তুৎমিসের দূরদর্শিতা ও তৎপরতায় ভারতবর্ষ একটি গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা পায়। খাওয়ারজম (খিবা)-এর তৎকালীন শাহ জালালউদ্দীন মঙ্গবারানী মধ্য-এশিয়ার বিখ্যাত মঙ্গোল-নায়ক চেঙ্গিস খাঁ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে আশ্রয়ের জন্য পঞ্জাবে উপস্থিত হলেন। চেঙ্গিস খাঁও তাঁর শত্রুকে অনুসরণ করে সিন্ধু-নদের তীরদেশে উপস্থিত হলেন। ইল্‌তুৎমিস্‌ এই অবাঞ্ছিত অতিথিকে

ভারতে আশ্রয় দিলেন না। ফলে চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পায়। তিনি কুত্‌ব-মিনারের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন এবং সুন্দর সুন্দর কয়েকটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন।

সুলতান রাজিয়া (১২৩৬-৪০)

ইল্‌তুৎমিস্‌ তাঁর কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসন দিয়ে যান। রাজিয়াই ছিলেন একমাত্র নারী, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। সুলতানা রাজিয়া পুরুষের পোশাক পরে দরবারে বসতেন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু কয়েকজন শক্তিশালী আমীর-ওমরাহ্‌ স্ত্রীলোকের শাসন মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা সুলতানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রাজিয়া এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন।

নাসিরুদ্দিন (১২৪৬-৬৬)

গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বন (১২৬৬-৮৭)

সুলতানা রাজিয়ার পরে ইল্‌তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন সুলতান হলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী ও শ্বশুর উলুঘ খাঁ, দৃঢ়ভাবে শাসনকার্য চালাতেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরে উলুঘ খাঁ, গিয়াস্‌উদ্দীন বলবন নাম ধারণ করে দিল্লীর সুলতান হলেন। প্রথম জীবনে তিনিও ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কঠোর ছিলেন। তাঁর সতর্কতা ও কর্মদক্ষতার জন্যই মঙ্গোল বা অন্য কোনো শত্রু সাম্রাজ্যের ক্ষতি করতে পারেনি। সাহিত্য ও শিল্পে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। ঐতিহাসিক মীনহাজ-ই-সিরাজ ও কবি আমীর খুসরু বলবনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বলবনকে নিঃসন্দেহে দাসবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যেতে পারে।

খল্‌জী বংশ : আলাউদ্দীন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬)

বলবনের মৃত্যুর পরেই দাসবংশের পতন ঘটে। তখন জালালউদ্দীন খল্‌জী নামে একজন বৃদ্ধ সেনাপতি দিল্লীর সুলতান

হলেন। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন-খল্‌জী দিল্লীর সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান। যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে সারা ভারত জুড়ে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।


আলাউদ্দীন খল্‌জী

এতবড় সাম্রাজ্যে যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সে বিষয়ে তিনি সতর্ক ছিলেন। আলাউদ্দীন সর্বদা বিদ্রোহের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে মেলামেশা, বৈবাহিক-সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি নিষিদ্ধ হলো। সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে কঠোর নজর রাখা হতো। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হল। রাজকরের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হল। তিনি মনে করতেন যে, প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় করে রাখা হলে তাদের সমস্ত শক্তি জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যয়িত হবে, বিদ্রোহের চিন্তা তাদের মনে স্থান পাবে না।

বাজারের জিনিসপত্রের দাম তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি সরকারী শস্য-ভাণ্ডারও খুলেছিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য মজুত রাখা নিষিদ্ধ হয়েছিল। দোকানদারেরা জিনিসের ওজন কম দিলে কঠোর শাস্তি পেত। সামরিক বাহিনীর সুবিধার জন্য জিনিসের দাম কমান হয়েছিল যাতে কম দামে সৈন্যরা সব জিনিস কিনতে পারে। সুলতান রাজকর্মচারীদের জায়গীর-দান প্রথা রহিত করে তাদের বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুলতানের নির্দেশের ফলে তাঁর সাধারণ প্রজারা চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল।

তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই খল্‌জী বংশের পতন হয়।



তুঘলক বংশ

১৩১৬ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কিছুদিন সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি চলতে থাকে। তারপরে গিয়াসুদ্দীন

তুঘলক নামে এক সেনাপতি দিল্লীর সুলতান হলেন। তিনিই তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গিয়াসুদ্দীনের পর তাঁর পুত্র ফকরুদ্দীন মহম্মদ জৌনা খাঁ, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-৬১)

ভারতের মুসলমান সুলতানদের ইতিহাসে মহম্মদের মত চরিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্বীয় কার্যাবলী দিয়ে নিজেকে কখনও নৃশংস হত্যাকারী, কখনও অত্যন্ত দয়াশীল, কখনও উন্মাদ, কখনও দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তির মত নিজের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। সাহিত্য, গণিত, দর্শন, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান পণ্ডিতদেরও বিস্ময় উৎপাদন করতো।



মহম্মদ-বিন্-তুঘলক

সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি দোয়াব অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব বাড়িয়ে দিলেন। এই সময়ে ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও সুলতানের আদেশে রাজকর্মচারীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কর আদায় করতে লাগল। কৃষকেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। দোয়াব অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।

মহম্মদ দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন করলেন। প্রজাদের জোর করে নতুন রাজধানীতে যেতে বাধ্য করা হলো। আট বছর পর পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী ফিরিয়ে আনলেন।

১৩২৯ খ্রীস্টাব্দে উচ্চতর অর্থমূল্যযুক্ত তামার নোট প্রচলন করে সুলতান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু

তাঁর এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। কয়েকটি সামরিক অভিযানেও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন।

মহম্মদের এই সমস্ত অব্যবস্থায় রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়লো। ক্রমে ক্রমে মালব, বাংলা, গুজরাট, আযোধ্যা এবং দাক্ষিণাত্যেও কয়েকটি প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বিদ্রোহ দমনের জন্য মহম্মদ রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করতে লাগলেন। অবশেষে ১৩৫১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮)

চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও বিশৃংখলার মধ্যে মহম্মদ তুঘলকের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ফিরোজশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

মহম্মদ তুঘলকের ধর্মমত ছিল উদার; তাই তিনি গোঁড়া মুসলমানদের সমর্থন লাভ করেছিলেন। হিন্দুদের উপরে তিনি জিজিয়া করের বোঝা চাপিয়েছিলেন, তাঁদের দেব-দেবী ও দেবালয় ধ্বংস করেছিলেন।

ফিরোজাবাদ, হিসার, ফিরোজপুর, ফতেহাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি নগর তাঁর আমলেই নির্মিত হয়েছিল। ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দে সুলতানের মৃত্যু হয়।

সুলতানি আমলের অবসান

ফিরোজের মৃত্যুর পরে দেশব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে মোঙ্গলদের চাঘতাই বংশের তৈমুর ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

অতঃপর সৈয়দ বংশের চারজন সুলতান এবং পাঠান লোদী-বংশের তিনজন সুলতান প্রায় ১১২ বছর রাজত্ব করেন। লোদী-বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের হস্তে পরাজিত হলেন (১৫২৬)। ভারতে সুলাতনি আমলের অবসান হলো এবং মোগল সাম্রাজ্যের ভিত প্রতিষ্ঠিত হলো।

সুলতানি আমলে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা

প্রথম যুগে সুলতানেরা হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে উৎসাহী ছিলেন। রাজদরবারে চাকরি ও প্রতিপত্তিলাভের প্রলোভনেও অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমান হয়েছিল। ধর্মান্তরিতদের নিয়েও এক নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়।

সুলতানি যুগের সমাজে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান স্বয়ং এবং তারপর পদমর্যাদা অনুসারে স্থান পেতেন আমীর-ওমরাহ্ গোষ্ঠী। সাধারণ রাজকর্মচারী, শিল্প-কারিগর, বণিক-ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত হতো মধ্যবিত্তশ্রেণী। সমাজে নারীর অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। হিন্দুসমাজে গোঁড়ামি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

গ্রামসমূহ ছিল অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। কৃষি ও শিল্পের নানা কাজ ছিল জীবিকা লাভের প্রধান উপায়। খাদ্য-বস্ত্রের অভাব সে যুগে তেমন ছিল না। নানা ধরনের পোশাকী বস্ত্র, নীল, আফিম্ প্রভৃতি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। দেশীয় শিল্পের মধ্যে কাপড়, চিনি, কাগজ ও পাদুকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হতো। অত্যধিক করভারে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। হিন্দুদের উপরে জিজিয়া, তীর্থকর প্রভৃতি কর চাপানো হয়েছিল।

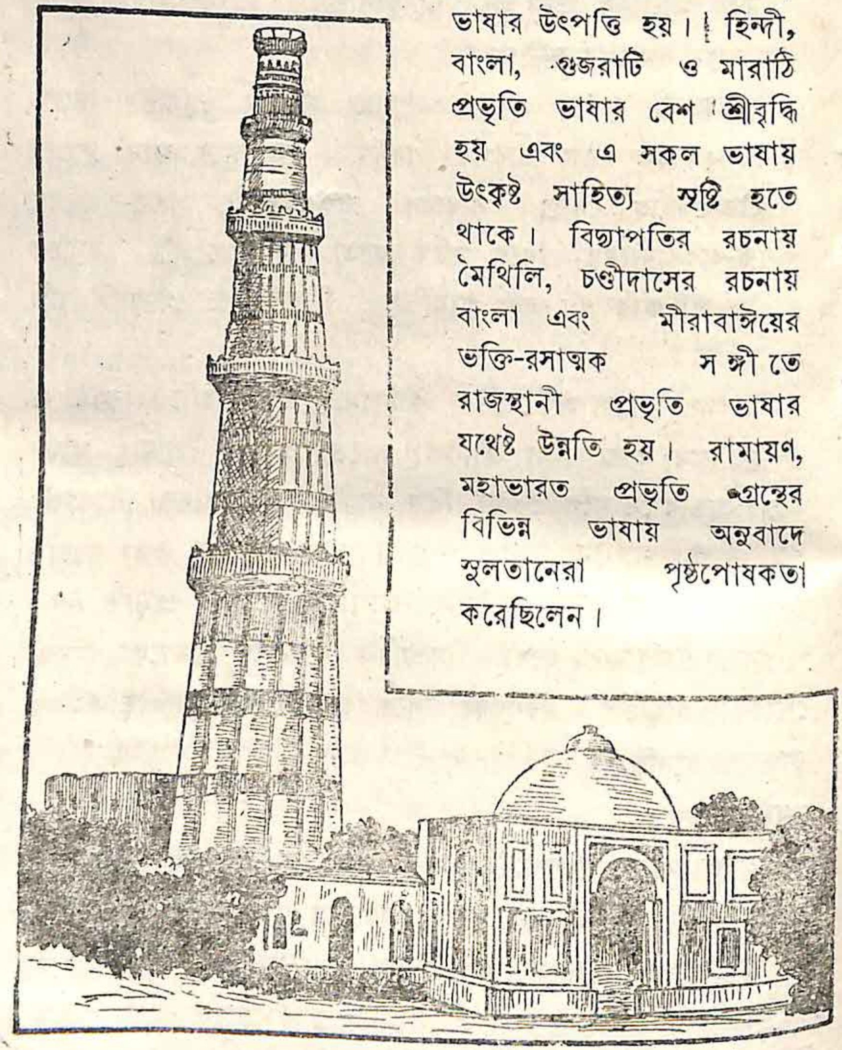
॥ ধর্ম-সমন্বয় ॥

ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় পূর্ব ও পশ্চিমের মত। কিন্তু এক সাথে বসবাসের ফলে এবং শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমানদের চেষ্টায় সমন্বয়ের নতুন পথে এলো হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ ও ইসলামী সুফীমতবাদ। ভক্তিবাদী সাধকেরা প্রচার করলেন, মানবপ্রীতিই ঈশ্বর-আরাধনার শ্রেষ্ঠ

পথ। সুফী সাধকেরা ইসলামের মূল লক্ষ্য মানব-প্রীতি সহজ সরল-ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে যাচ্ছিলেন। সুফীয়ানী মতে সাধনা করে অনেক মুসলমান সাধক আউল, বাউল, ফকির প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

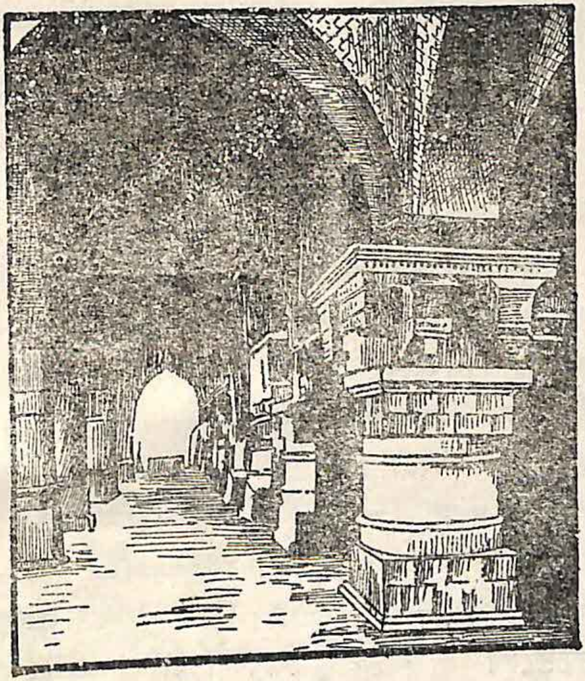
॥ সাহিত্য ও শিল্পকলা ॥

আরবী, ফার্সী ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে এ সময় থেকে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। হিন্দী, বাংলা, গুজরাটি ও মারাঠি প্রভৃতি ভাষার বেশ শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং এ সকল ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। বিদ্যাপতির রচনায় মৈথিলি, চণ্ডীদাসের রচনায় বাংলা এবং মীরাবাঈয়ের ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতে রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদে সুলতানেরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।



কুতুব মিনার

মুসলমান সুলতানেরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ভগ্ন-মন্দিরসমূহের উপকরণ দিয়েই নতুন মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। ফলে স্থাপত্যশিল্পে হিন্দুপ্রভাব সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। এ যুগের শিল্প-স্থাপত্যে আঞ্চলিক প্রভাব সুস্পষ্ট রয়েছে। দিল্লীর কুতুব মিনার থেকে বিভিন্ন সমাধি-মন্দির, আমেদাবাদের জাম-ই-মসজিদ, গুজরাটের বিভিন্ন মসজিদ-মিনারে আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষ্য করার মত। জৌনপুরী-রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো আতাল-মসজিদ ও



আদিনা-মসজিদ

জাম-ই-মসজিদ। আদিনা মসজিদ, সোনা-মসজিদ, কদমরসুল প্রভৃতিতে বাঙালী প্রভাব সুস্পষ্ট রয়েছে। দাক্ষিণাত্যে মধ্যযুগীয় শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো বিজাপুরের গোলগম্বুজ, দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার প্রভৃতি।

॥ কয়েকজন ভক্তিবাদী সাধক ॥

রামানন্দ ও কবীর—দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের বাণী বহন করে আনলেন রামানন্দ। তিনি ছিলেন বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক রামানুজের শিষ্য। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে এই নতুন ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার সংকল্প তিনিই ব্যক্ত করলেন।


কবীর

রামানন্দের প্রধান ভক্ত ছিলেন কবীর। তিনি ছিলেন মুসলমান। প্রবাদ আছে যে, তিনি ব্রাহ্মণ হয়েও এক মুসলমান তাঁতীর পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি প্রচার করলেন, 'রাম' ও 'আল্লাহ্' এক এবং অদ্বিতীয়। কবীরের 'দোঁহা' সমূহ ধর্মে নতুন প্রাণের সঞ্চার করলো।

গুরু নানক—শিখধর্মের প্রবর্তক নানক ছিলেন আর একজন ভক্তিবাদী সাধক। নানা তীর্থ ভ্রমণ করে সকল ধর্মের মূল উৎসের সন্ধান করে তিনি সমন্বয়ী শিখ-ধর্মের প্রচার করলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলকেই শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন।


নানক

শ্রীচৈতন্যদেব—বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন নানকের প্রায় সমসাময়িক। ভক্তিবাদের প্লাবনে তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলকে ভাসিয়ে দিলেন। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নদীয়ার নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করার

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। যে উত্তরটি ঠিক তার পাশে √ দাগ দাও :

(ক) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়—১১৯০ খ্রীস্টাব্দে / ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে / ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে।

(খ) কুতুবমিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন—ইলতুৎমিস্ / গিয়াসুদ্দীন / কুতুবুদ্দীন আইবক।

(গ) খিল্‌জী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন—জালালুদ্দীন খিল্‌জী / আলাউদ্দীন খিল্‌জী / গিয়াসুদ্দীন খিল্‌জী।

(ঘ) লোদী বংশের শেষ সুলতান ছিলেন—দৌলত খাঁ লোদী / ইব্রাহিম লোদী / বহলুল্ লোদী।

(ঙ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়—১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে / ১৫৫৬ খ্রী. / ১৫৪০ খ্রী.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয় কিভাবে?

২। এই সময় কোন্ কোন্ ভাষার উৎপত্তি হয়?

৩। জৌনপুরী শিল্প-রীতির দুটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখাও।

৪। দাক্ষিণাত্যে মধ্যযুগীয় শিল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?

প্রেম

করেছি ।। কবীর কে ছিলেন? তিনি কি প্রচার করেন?

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান কোথায় ছিল?

বাংলার ন ...দীন সুলতান কে ছিলেন?

বাংলাদেশে সুলতা ...ক উপাধি লাভ করেন?

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আমলে এক বিদ্রোহের ফলে... সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। ১৩৪৫ খ্রীস্টাব্দে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসাবে সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইলিয়াসশাহী বংশের সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ পরে সুলতান হলেন।

সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্, রুকনুদ্দীন বারবকশাহ্, হুসেন শাহ্ এবং নসরৎ শাহ্ প্রমুখ সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায়

(ঘ) বাংলার চৈতন্যদেব ছিলেন — প্রায় সমসাময়িক।
(ঙ) চৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন —।
(চ) মহাকবি কৃত্তিবাস — রচনা করেন।
(ছ) শ্রীরূপ গোস্বামীর — — সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।
(জ) হুসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন —।
(ঝ) এই সময় ন্যায়শাস্ত্রের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন —।
(ঞ) হুসেন শাহের দুজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নাম — ও —।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে তুর্কিস্থান গঠিত ছিল?
২। কে সতেরবার ভারত আক্রমণ করেছিল?
৩। ঘুর রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল?
৪। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হয়? এই যুদ্ধের ফলাফল কি?
৫। উত্তর ভারতে কোন্ কোন্ দুটি রাজপুতবংশ রাজত্ব করেছিল?
৬। তুর্কি আফগানীরা কত বৎসর শাসন করেছিল?
৭। কোন্ বংশকে কেন দাস রাজবংশ বলা হয়?
৮। কুতুবমিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন কে?
৯। ইলতুৎমিস্ কাদের পরাজিত করেন?
১০। কোন্ নারী দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন?
১১। উলুখ খাঁ পরবর্তীকালে কি নাম ধারণ করেন?
১২। বলবনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এমন দুজনের নাম কর।
১৩। দাসরাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন?
১৪। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
১৫। মহম্মদ কোথায় রাজধানী পরিবর্তন করেন?
১৬। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে কে কে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন?
১৭। দাক্ষিণাত্যে মধ্যযুগীয় শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?
১৮। রামানন্দের প্রধান শিষ্য কে ছিলেন?
১৯। শিখধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?
২০। মহাপ্রভুর বাণী কি ছিল?
২১। কে গুণরাজ খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রবেশিকা

নবযুগ

ইতিহাস আবার মধ্যযুগের পুরানো পথ পরিবর্তন করে আর একটি নতুন যুগের পথে যাত্রা করলো। এ যুগকে আমরা বলি **নবযুগ বা বর্তমান যুগ।**

আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। ইউরোপের বিভিন্ন মনাস্টারি ও মঠ-বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার যে সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে, তা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এ সময়ে বিজ্ঞান ও দর্শন পাঠে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী পণ্ডিত **আবেলার্ড** ও অক্সফোর্ডের **রজার বেকন** যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী আক্রমণে **কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে** সেখানকার গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতেরা তাঁদের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি-পত্র নিয়ে আশ্রয়ের জন্য ছুটলেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ইটালী এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও তাঁরা সমাদরে গৃহীত হলেন। এতদিন পর্যন্ত গ্রীক ও রোমান চার্চের মধ্যে যে মতভেদ ছিল এই ঘটনার ফলে তা অনেকটা বিদূরিত হলো।

পণ্ডিতদের সযত্নে রক্ষিত গ্রীক ও রোমান প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পাঠ করার সুযোগ পেলেন। এখন থেকে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, প্রাচীন পণ্ডিতদের পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারাকে দাবিয়ে রাখার মত মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানের কড়াকড়ি প্রাচীনকালে ছিল না। কেমন আনন্দময় পরিবেশে সে-যুগের লোকেরা জীবন যাপন করতেন, কেমন স্বাধীনভাবে তাঁরা

তাঁদের গ্রন্থসমূহে মতামত ব্যক্ত করতেন। এ সময় থেকেই **প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে** ইউরোপবাসী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এমন পরিস্থিতিতে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে **রেনেসাঁস** বা **সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন** শুরু হয়। ঐতিহাসিকদের মতে এ সময় থেকেই নবযুগ বা বর্তমান যুগের সূচনা হলো।

মধ্যযুগের সামন্তপ্রথা, চার্চের নানা বিধি-নিষেধ, পোপ ও সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা তখনকার মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের যেন একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছিল। মধ্যযুগের মানুষেরা যেন ছিল নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। পোপ ও সম্রাট এবং তাঁদের অনুগৃহীত যাজক ও সামন্তেরা যা বলতেন, সেগুলিই তারা বিনা বিচারে মেনে নিতে বাধ্য হতো। তাদের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল পোপ সম্রাটদের ন্যায়দণ্ড।

গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টট্‌লের** গ্রন্থের আরবীয় অনুবাদ সংগ্রহ করে চার্চের পণ্ডিতেরা তাঁদের নিজেদের বিধান অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদ বলে এতদিন চালিয়ে এসেছিলেন। এখন মূল গ্রন্থ পাঠ করে দেখা গেল যে, এতদিন তাদের শুধু ভুলই বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার সাধনে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতরা আরও অনুপ্রাণিত হলেন। বিবেকবুদ্ধির এই নতুন সচেতনতার জন্যই রেনেসাঁস আন্দোলনেন সূচনা।

আত্মপ্রকাশের তাগিদেই **মেকিয়াভেলী** তাঁর নতুন রাজনৈতিক চিন্তাকে ব্যক্ত করলেন ; **লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জোলো** এবং পরবর্তী সময়ে **রেমব্রেণ্ট** প্রমুখ শিল্পী তাঁদের অমর তুলিতে অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি করলেন। জন গুটেনবার্গ মুদ্রণের এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করলেন। মুদ্রণ-যন্ত্রের সাহায্যে বই ছাপানো শুরু হওয়ার ফলে **অ্যারিস্টট্‌ল, প্লেটো, ভার্জিল, হোরাস, প্লিনি** প্রভৃতি প্রাচীন যুগের লেখকদের গ্রন্থসমূহ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে আর অপরিচিত রইলো না।

এ সময় থেকে ইউরোপের পণ্ডিতেরা জানতে পারলেন যে, জ্ঞানলাভের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে তারা হলো মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নব নব আবিষ্কারের কাজে প্রবৃত্ত হলেন।

কম্পাস আবিষ্কৃত হওয়ায় সমুদ্র-যাত্রার ভয়-ভীতি কেটে গেল। বড় সমুদ্রে পাড়ি দিতে হলে বড় জাহাজের দরকার। বড় জাহাজ তৈরি করতে যন্ত্রপাতির নির্মাণ এবং তাদের ব্যবহার জানা প্রয়োজন। জাহাজের গতি বাড়াতে গেলে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের সাধনায় পণ্ডিতেরা নিমগ্ন হলেন।

পৃথিবীর **ভৌগোলিক অবস্থান** সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার নিরসন হলো। ফলে ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রেরণায় ইউরোপের দুঃসাহসী নাবিকেরা জলপথের সন্ধানে বের হলো। অনেক নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হলো। **শিল্পবিপ্লবের প্রেরণা** এ সময় থেকেই শুরু হলো।

এ সময় থেকে ইউরোপের অধিবাসীরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠলো। তারা বুঝতে পারলো যে, একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ধর্ম, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারলে, তাদের সুবিধা হবে। তাই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে **জাতীয় রাষ্ট্র** গঠিত হতে লাগলো। হল্যাণ্ডের অধিবাসী ওলন্দাজেরাও জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের জন্য সংগ্রাম চালাতে লাগলো।

জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চার্চের প্রতিষ্ঠা হলো, জাতীয় সাহিত্য চর্চায় নতুন উদ্যম দেখা দিল। বারুদের ব্যবহার জানার ফলে সামরিক সাহায্যের জন্য আর সামন্তদের মুখাপেক্ষী থাকার প্রয়োজন রইলো না। সমাজ-জীবন থেকে সামন্ততন্ত্রের গ্লানি দূর করে দিয়ে ব্যক্তির শ্রমে উৎপন্ন শিল্পের প্রসার এবং পরে

যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দ্রুতগতিতে শিল্প-উৎপাদনের প্রচেষ্টা শুরু হলো।

শিল্প-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত কাঁচামাল। শিল্প-তৈরির যন্ত্রপাতি হাতের কাছে পেলেও কাঁচামাল না পেলে শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে না। তারপরে উৎপন্ন **শিল্প মুনাফা** নিয়ে বিক্রির জন্য প্রয়োজন হলো বড় বড় বাজারের। এই চাহিদা মেটাবার জন্যই **ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে আশ্রয় করে বৃহত্তর ইউরোপের সৃষ্টি হলো**। এক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দাপটে গোটা বিশ্বকে তোলপাড় করে তুলেছিল ইউরোপ।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এ দুটি শতাব্দী ধরে ইউরোপের জনসাধারণ আঘাত হানতে হানতে পুরানো সমাজ-ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিয়ে নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা শুরু করলো, **উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও** তার জের চলছে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনসাধারণ **স্টুয়ার্ট** রাজাদের **স্বেচ্ছাচারিতার** বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে **ফরাসী বিপ্লবের** ফলে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি অধ্যায় শেষ হলো। কিন্তু পরবর্তীকালে **শ্রেণী-শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম** শুরু হয়েছে তার পরিসমাপ্তি এখনও শেষ হয়নি।

সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, **নবযুগের আরম্ভ হয় ইউরোপে**। পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ নতুন ইউরোপের কাছ থেকেই নবযুগের সব কিছু উপকরণ পরে গ্রহণ করেছে।
